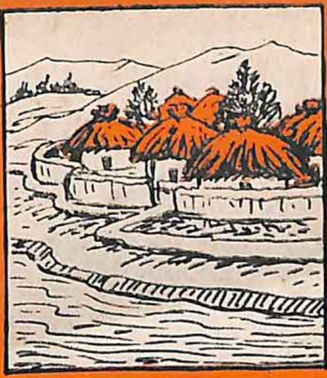
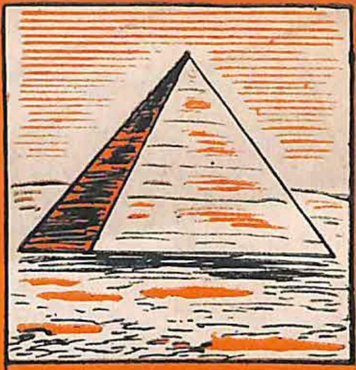
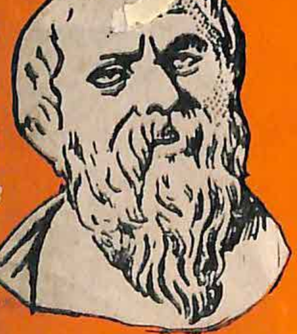
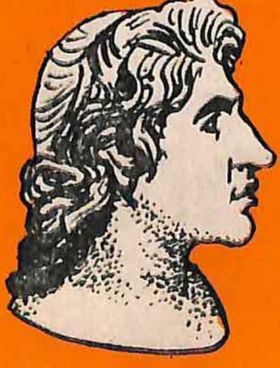





ইতিহাস পরিচয়




4504
6.4.89

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল ও মাদ্রাসা স্কুলের ১৯৮০
সালের পাঠ্যবর্ষ হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত
Notification No. TB/VI/H/79/111, Dated 5. 12. 79.

ইতিহাস পরিচয়

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

অধ্যাপক কিরণশঙ্কর চৌধুরী, এম. এ.

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

কে. সি. সরকার এণ্ড কোং
১২২বি, রাজা রামমোহন সরণি (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট),
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

ইতিহাস পরিচয়

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

অধ্যাপক কিরণশঙ্কর চৌধুরী, এম. এ.

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

কে. সি. সরকার এণ্ড কোং
১২২বি, রাজা রামমোহন সরণি (আমহার্ষ্ট স্ট্রীট),
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
কে. সি. সরকার,
১২২বি, রাজা রামমোহন সরণি (আমহার্স্ট স্ট্রীট),
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 6. 7. 89
Acc. No. 4504

H VI
KIR

মূল্য : ৮·০০

[ভারত সরকার কর্তৃক দেয় স্বল্প মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রতাপরঞ্জন রায়
রামকৃষ্ণ প্রেস,
৯এ, রামধন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

ভূমিকা

মানুষ নিজের অতীতকে কখনও অস্বীকার করতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাজকে আরও সহজ ও সুন্দর করতে সাহায্য করে। ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে যেয়ে এই কথাগুলোই বারবার মনে হয়েছে। শুধু তা কেন, এ হচ্ছে বাস্তব সত্য। এই বাস্তব সত্যকে এই বইতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই বইটা যদি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে আসে তবে নিজের পরিশ্রমকে সার্থক মনে করে আনন্দ পাব। এই বইটাকে আরও সুন্দর করার কোন প্রস্তাব যদি কেউ দেন তা সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ মানব সভ্যতার গোড়ার কথা		১—৫
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥		
ইতিহাস পড়া প্রয়োজন কেন?	...	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥		
প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস জানা যায় কিভাবে?	...	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আদি মানব		৬—১৬
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥		
তিনলক্ষ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আগুনের ব্যবহার ও পিকিং-এর গুহামানব, খাদ্যের সন্ধানে আদিমানব।	...	৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥		
পুরাতন প্রস্তর যুগ, পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্র ও হাতিয়ার, হাতিয়ার ও অস্ত্রের ব্যবহার।	...	৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥		
নূতন প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র।	...	৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥		
কৃষির আবিষ্কার ও খাদ্য উৎপাদন।	...	১১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥		
নূতন প্রস্তর যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন—পশুপালন, মাটির পাত্র, সূতির পোষাক।	...	১১
ষষ্ঠ পারচ্ছেদ ॥		
বাসস্থান, পরিবহণ ব্যবস্থা, শিল্পবোধ প্রভৃতি।	...	১৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥		
ভাষার ব্যবহার ও ধর্মবিশ্বাস।	...	১৪
তৃতীয় অধ্যায়ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ		১৭—২২
প্রথম পরিচ্ছেদ ॥		
নগরের উৎপত্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর, বিভিন্ন পেশায় পারদর্শিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।	...	১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥		
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সামাজিক জীবনধারার রূপান্তর।	...	১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥		
গোষ্ঠী সংঘাত ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থা।	...	১৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

নদী উপত্যকায় মানব সভ্যতা গড়ে উঠার কারণ। ... ২০

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রাচীন সভ্যতা ২৩—৫২

(৩০০০ খ্রীঃ পূঃ—১৫০০ খ্রীঃ পূঃ)

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

মেসোপটেমিয়া—অবস্থান, উর্বরতা, শস্য উৎপাদন ; বন্যা ও তার প্রতিকার, অন্যান্য কাজ, সুমেরীয়দের কৃতিত্ব। ... ২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মিশর—অবস্থান ও জমির বৈশিষ্ট্য, ফারাও, পুরোহিত, অক্ষর, কর আদায়কারী ; সামরিক বাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, পিরামিড, ধর্ম-বিশ্বাস, প্রধান জীবিকা। ... ২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সিন্ধু সভ্যতা—আবিষ্কার ও স্থান, শহরের পরিকল্পনা—(বাড়ি, রাস্তাঘাট), খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারিক জিনিস—(পোষাক, আসবাবপত্র), কারিগরী শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পূজো, প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী বিভাগ। ... ৩৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

চীন—হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর উপত্যকা, প্রাচীন চীন, বন্যা ও পৌরাণিক কাহিনী। ... ৪৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

নদীমাতৃক সভ্যতাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। ... ৪৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ লৌহ যুগ ও মানব-সমাজ ৫৩—১১৭

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

লোহার আবিষ্কার, তার ব্যবহার ও এর ফল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক, রাজতন্ত্রের উত্থান। ... ৫৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ব্যাবিলন—কৃষি ও বাণিজ্য, মন্দির ও পুরোহিত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, হামুরাবির আইন ও সামাজিক অবস্থা। ... ৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মিশর ও তার সাম্রাজ্য—উপনিবেশ, পুরোহিতদের ক্ষমতা। ... ৫৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

ইরান—পারস্যের উত্থান, জরথুষ্ট্র। ... ৬০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ইহুদী (হিব্রু)—মিশরে হিব্রুদের অবস্থান, মোজেস ও দাসত্ব থেকে হিব্রুদের মুক্তি। ... ৬২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

গ্রীস দেশের ইতিহাস—হোমারের যুগ, নগর ও রাষ্ট্র, সাংস্কৃতিক বিকাশ, উপনিবেশ। ... ৬৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

এথেন্স ও স্পার্টা—এথেন্সের সামাজিক জীবন, এথেন্সের রাজনৈতিক জীবন, স্পার্টার সামাজিক জীবন, স্পার্টার রাজনৈতিক জীবন। ... ৬৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

এথেন্স ও স্পার্টার সংঘর্ষ। ... ৭০

নবম পরিচ্ছেদ ॥

এথেন্সের সাংস্কৃতিক ইতিহাস—সাহিত্য ও শিল্প। ... ৭১

দশম পরিচ্ছেদ ॥

গ্রীকদের ধর্ম। ... ৭২

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

শ্রেষ্ঠ গ্রীকগণ—পেরিক্লিস, সফক্লিস, সক্রেটিস, হেরোডোটাস। ... ৭৩

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

ম্যাসিডন। ... ৭৫

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

রোম—রোমের আদিকথা, কার্থেজের সাথে রোমানদের যুদ্ধ, প্রাচীন রোমের সমাজ ব্যবস্থা, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, রোমান নাগরিকত্ব, দাসত্ব ও স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ। ... ৭৭

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

জুলিয়াস সীজার—সাধারণতন্ত্রের অবসান, নূতন সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যের পতন, খ্রীষ্টান ধর্মের উত্থান। ... ৮৬

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

চীন—মহান শাং বংশ, কনফুসিয়াস—তার শিক্ষা, চীনের মহা প্রাচীর, চীন সাম্রাজ্য। ... ৮৯

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

ভারতবর্ষ—আর্যদের ভারতে আগমন, বেদ, আর্যদের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম, আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থা। ... ৯৪

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥

মহাকাব্য—মহাভারত, রামায়ণ। ... ৯৭

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান—জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম। ... ১০০

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:—মৌর্য সাম্রাজ্য—কুষাণ—গুপ্ত সাম্রাজ্য: মৌর্য সাম্রাজ্য ও চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক; কুষাণ সাম্রাজ্য; গুপ্ত সাম্রাজ্য—সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ... ১০৩

বিংশ পরিচ্ছেদ ॥

গুপ্তদের পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার ইতিহাস। ... ১০৭

একবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

বৈদেশিক যোগাযোগ ও ভারতের সমাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তার প্রভাব। ... ১০৯

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

মেগাস্থিনিস ও ফাহিয়েন—মেগাস্থিনিসের বর্ণনা, ফা-হিয়েনের বর্ণনা। ... ১১০

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিকাশ—শিল্প ও স্থাপত্য শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান। ... ১১১

———

এই পৃথিবীর জন্মের হাজার হাজার বছর পরে এখানে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই প্রাণীদের মধ্যে মানুষের জন্ম হয়েছে সব থেকে শেষে। এই মানুষ যখন প্রথম বন্য জন্তুর মত বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় ঘুরে বেড়িয়েছে এবং যখন যা পেয়েছে তাই খেয়েছে, তখন তার কাছে বেঁচে থাকাটাই ছিল বড় সমস্যা। সে ছিল প্রকৃতির কাছে বড় অসহায়। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল, সে বনের ফল-মূল আর বন্য জন্তুর কাঁচা মাংস খেয়ে বাঁচার পরিবর্তে আরও ভালভাবে ও নিরাপদে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগল। তার মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ দেখা গেল। এই ভালভাবে বাঁচবার প্রয়োজনে তারা দলবেঁধে চলতে লাগল। তারা পশুপালন শিখল। তারা আবিষ্কার করল আগুনের ও কৃষির। এমনিভাবে তারা আবিষ্কার করল ধাতুর ব্যবহার। মানুষের জীবনধারা পাল্টাতে লাগল ক্রমশ। গড়ে উঠল গ্রাম ও নগর। কিন্তু মানুষের মধ্যে শুরু হয়ে গেল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই। সবলেরা বার বার দুর্বলদের পরাজিত করেছে ও তাদের পরিণত করেছে ক্রীতদাসে। এমনি ভাবেই গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজ. ব্যবস্থা, রাষ্ট্র প্রভৃতি। সমাজে সৃষ্টি হয়েছে ধনী ও দরিদ্রশ্রেণীর। সৃষ্টি হয়েছে রাজ্য ও সাম্রাজ্যের। আর মধ্য যুগের আরম্ভে দেখা গিয়েছে জমিদারী বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস পড়া প্রয়োজন কেন

আজ মানুষ সভ্যতার গর্ব করে। আরামে থাকার জন্য নানা জিনিস সে ব্যবহার করছে। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানে মানুষ আজ চরম উন্নতি লাভ করেছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে মুহূর্তে অন্যপ্রান্তে খবর পৌঁছে যাচ্ছে। এই ভাবে মানুষের সভ্যতা আজ এত উন্নত হয়েছে যে, মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, গ্রহ-গ্রহান্তরে রকেট পাঠাচ্ছে।

কিন্তু মানুষের এই সভ্যতা কি একদিনেই গড়ে উঠেছিল? ইতিহাস বলে মানুষের সভ্যতার বয়স কয়েক হাজার বছরের। **ইতিহাস বলতে তাই বোঝায় প্রথম থেকে মানব সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক কাহিনী ও তার বিশ্লেষণ। তাই ইতিহাস নিছক গল্প নয়, ইতিহাস হচ্ছে সমাজ-বিজ্ঞান।**

একদিন আমাদের পূর্বপুরুষরা বন্যজন্তুর মত ছিল অসভ্য। তারা কাঁচা মাংস খেত। তাদের থাকারও ছিল না কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান। প্রকৃতির কাছে তারা ছিল অসহায়। সেই অবস্থা থেকে কি করে মানুষ আজ এত উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলল তা জানবার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের ইচ্ছা করে। তাই আমাদের কাছে ইতিহাস পড়ার আকর্ষণ এত বেশী।

এই ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কি করে এই পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হল, কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আস্তে আস্তে মানব সভ্যতা গড়ে উঠল। আরো জানা যায় কিভাবে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলল এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হল। মানুষের উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলতে ক্রীতদাস বা দরিদ্রশ্রেণীরও যে বিশেষ ভূমিকা ছিল তা জানা যায় এই ইতিহাস থেকেই। তাই ইতিহাস মানে শুধু সন-তারিখ, রাজা বা সাম্রাজ্যের কাহিনী নয়, ইতিহাস মানে সমগ্র মানব সমাজের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ। ইতিহাস দেখিয়েছে কি করে ক্রীতদাস বা নিপীড়িত মানুষগুলো নিজেদের অধিকার লাভের জন্য অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ইতিহাস বার বার দেখিয়েছে অতীতে মানব সমাজ কি কি ভুল করেছে। এর অর্থ হল বর্তমান ও ভবিষ্যতে যাতে সেই ভুল আর না হয়। ইতিহাস তাই মানুষকে যুগ যুগ ধরে অভিজ্ঞ করেছে ও সচেতন করেছে। যে **প্রাইমেটরা** দুপায়ে চলাফেরা করতে শিখেছিল, তাদের বংশধরেরা আজ কি করে সভ্যতার আলোতে উজ্জ্বল করেছে এই পৃথিবীকে ইতিহাস তার একমাত্র সাক্ষী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস জানা যায় কিভাবে

হাজার হাজার বছর আগে মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। কারণ সে সম্বন্ধে লিখিত কোন তথ্য নেই। তবে কি করে জানা গেল আদিম যুগের মানুষদের কথা এবং এই মানুষদের চেহারা ও জীবনযাত্রার ক্রমপরিবর্তনের কথা?

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আদিম যুগের মানুষের মাথার খুলি, চোয়াল, হাড়গোড় ও তাদের ব্যবহৃত কিছু জিনিস, পাথরের অস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গেছে। আর এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে তাদের সম্বন্ধে কিছু জানা। এই যুগের ঐতিহাসিক তথ্য নেই বলে এই যুগকে বলা হয় **প্রাগৈতিহাসিক যুগ**।

তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও পরীক্ষা কাজে লাগানো হয়েছে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহে। এই প্রসঙ্গে **'রেডিয়াম কার্বন'** প্রথা বিশেষ দরকার হয়েছে। এর সাহায্যে প্রাপ্ত মাথার খুলি, চোয়াল, পাথরের অস্ত্র ও আসবাবপত্র প্রভৃতি কতদিনের পুরনো তা' জানা সম্ভব হয়েছে। এরপর মানুষের ব্যবহৃত জিনিস, নগরের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য অনেক জিনিস পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়ে। পরে পাওয়া গেছে বিভিন্ন লিপি ও পুরাকাহিনী। এই সমস্ত উপাদান থেকে ঐতিহাসিকেরা মানুষের জীবন-যাত্রা, সমাজ ও সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক কাহিনী লিখেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস লিখতে ঐতিহাসিকেরা সাহায্য নিয়েছেন নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য উপাদানের।

নৃতাত্ত্বিক উপাদান: প্রাণীদেহের প্রস্তরীভূত শিলা বা ফসিল পাওয়া গেছে। তা থেকে জীবজন্তুর ইতিহাস যেমন জানতে পেরেছেন নৃতাত্ত্বিকরা, তেমনি মানুষের মাথার খুলি, চোয়াল, হাড়গোড়া প্রভৃতি

থেকে তাঁরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা জেনেছেন মানুষের মুখের ও চেহারার গঠন। তাঁরা আরো জেনেছেন কি করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও যুক্তি দিয়ে বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডারউইন এইভাবেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের চেহারার গঠন, প্রকৃতি ও জীবন-ধারার ক্রমপরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে লিখেছেন। এই নৃতাত্ত্বিকদের সাহায্যেই জানা গেছে প্রাইমেট, গুহামানব, পুরাতন ও নূতন প্রস্তর যুগের মানুষদের চেহারা, চাল-চলন ও জীবনধারণের কথা।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান : প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলো প্রাচীন যুগের মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস লিখতে আরও সাহায্য করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মাটির তলা থেকে খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন ঘর-বাড়ি, নগরের ধ্বংসাবশেষ, নানাপ্রকার মাটির পাত্র, মূর্তি, শীলমোহর এবং এমনি আরও নানা জিনিস। এই সব জিনিস থেকেই জানা গেছে প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন ও ভারতের সিন্ধু সভ্যতার কথা ও ফিনিসিয়দের কথা।

এই সমস্ত নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলো নিয়ে ঐতিহাসিকেরা রচনা করেছেন প্রাচীন যুগের মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস। আর মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস লেখা তাঁদের পক্ষে আরও সহজ হয়েছে প্রাচীন যুগের কিছু লেখা ও পুরাকাহিনী পাওয়া গেছে বলে। শুকনো তালপাতা, মাটির পাত্র, তামার পাত ও শিলা-লিপিতে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু তাদের অনেকগুলোর পাঠোদ্ধার করা আজও সম্ভব হয়নি। তাই অনেক তথ্যই অজানা রয়ে গেছে। যখন যেটুকু পাওয়া গেছে তা থেকেই অনুমান ও যুক্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিকেরা মানব সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করেছেন।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস কাকে বলে ?

২। ইতিহাস পড়া প্রয়োজন কেন ?

৩। মানব সভ্যতা সম্বন্ধে জানতে গেলে ইতিহাস পড়ার দরকার আছে কি ?

৪। প্রাচীনযুগের মানুষদের সম্বন্ধে আমরা কিভাবে জানতে পারি ?

৫। 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' বলতে কি বোঝ ?

৬। কতকগুলো প্রাচীন সভ্যতার নাম কর।

৭। ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞান বলা চলে কি ?

৮। প্রাচীনযুগের ইতিহাস জানতে নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা কিভাবে ঐতিহাসিকদের সাহায্য করেছেন ?

৯। 'রেডিয়াম কার্বন' প্রথা থেকে কি জানা যায় ?

১০। শূন্যস্থানে সঠিক উত্তর লেখ :—

(ক) মানুষ যে আজ এত উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয়েছে তার বয়স——। কয়েকদিনের ; কয়েক হাজার বছরের।

(খ) ইতিহাস বলতে বোঝায়——। সমাজ-বিজ্ঞান ; নিছক গল্প।

(গ) ইতিহাস পড়া প্রয়োজন——। মানব-জাতির ক্রমবিকাশ জানার জন্য ; রাজার জীবনী জানার জন্য।

(ঘ) মানব সভ্যতা গড়তে——। ক্রীতদাসদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। ক্রীতদাসদের কোন ভূমিকা ছিল না।

(ঙ) প্রাচীন সভ্যতা কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছিল——? মিশর, জার্মানী, জাপান, মেসোপটেমিয়া, চীন, ভারতের সিন্ধুউপত্যকা।

১১। নীচের শূন্যস্থানে হ্যাঁ বা না লেখ :—

(ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ সভ্য ছিল……।

(খ) প্রাইমেটরা দুপায়ে চলতে পারতো……।

(গ) প্রাচীনযুগের ইতিহাস লিখতে নৃতাত্ত্বিকদের সাহায্য দরকার……।

(ঘ) মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কোন ভূমিকা নেই……।

প্রায় দশলক্ষ বছর আগে আদিতম মানব বা এপ্-ম্যানদের প্রথম উদ্ভব হয়। এপ্-ম্যানরা অনেকটা গরিলা বা শিম্পাঞ্জীর মত দেখতে ছিল। আস্তে আস্তে তারা দুপায়ে ভর করে চলতে শেখে। প্রায় ৯০ বছর আগে দিল্লীর তিনশ কিলোমিটার উত্তরে শিবালিক পর্বত-মালায় শিলীভূত এপ্-ম্যানের হাড় পাওয়া গেছে। এইভাবে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর লেগে যায় আদি মানবের পূর্ণ চেহারা পেতে। এই আদি মানব বা গুহামানবদের কথা জানতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিকেরা জাভা-মানব ও পিকিং মানবদের কথা জানতে পেরেছেন। জার্মানিতেও এই মানবগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই আদিমানবদের গা লোমে ঢাকা ছিল। তারা কথা বলতে জানত না। শুধুমাত্র আওয়াজ করত। তারা কোন পোশাক পরতে জানত না। এই গুহামানবরা কাঁচামাংস খেত ও গাছের ফলমূল খেত। তাদের জীবন ছিল অনেকটা বন্য জন্তুর মত।

এই আদিমানুষদের মধ্যে আস্তে আস্তে কিছু পরিবর্ত্তন আসতে থাকে। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে, জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য আদিমানবদের চেহারা বিভিন্ন ধরনের দেখতে হয়। তাই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা চেহারা অনুসারে মানবজাতিকে মঙ্গোলয়েড, ইউরোপিঅয়েড, নিগ্রোয়েড-অষ্ট্রলয়েড প্রভৃতি ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিনলক্ষ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আগুনের ব্যবহার ও পিকিং-এর গুহামানব

আদিমানবদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পিকিং-এর গুহামানব। আজ থেকে প্রায় তিনলক্ষ বছরেরও আগে এই পিকিং মানবরা বাস করত পিকিং থেকে ৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে চাউকাউ-তিয়েনের এক গুহায়। প্রত্নতাত্ত্বিকের ঐ গুহার মধ্য থেকে এই গুহামানবদের অস্তিত্বের কথা আবিষ্কার করেছেন। এই গুহামানবদের

মাথা ও মুখের গঠন ছিল অদ্ভুত। এরা সোজ হয়ে চলাফেরা করত। এরা বনের ফলমূল খেত এবং ছোট বা মধ্যমাকারের জন্তু শিকার করে মাংস খেত। এরা সামনে পাওয়া লাঠি বা পাথর ব্যবহার জানত।

কিন্তু সব থেকে মজার বিষয় ছিল এই যে, এই গুহামানবরা আগুনের ব্যবহার জানত। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, পিকিং-এর এই গুহামানবরাই প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। বনেজঙ্গলে পশু শিকার করতে গিয়ে কোথাও আগুন জ্বলতে দেখলে তারা জ্বলন্ত কাঠ কুড়িয়ে গুহার মধ্যে নিয়ে আসতো। তা থেকে আগুন জ্বেলে এরা কাঁচা পশুর মাংস পুড়িয়ে খেত। এরা আবার হিংস্র পশু ও শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আগুন জ্বেলে রাখত। ক্রমে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে আস্তে আস্তে কিছুটা বুদ্ধির বিকাশ হচ্ছিল। খাদ্য জোগাড় করাই ছিল এদের প্রধান কাজ। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য এদের অনেক কষ্ট করতে হতো।

খাদ্যের সন্ধানে আদিমানব ঃ আদিমানবরা খাদ্য জোগাড় করতে সবসময় ব্যস্ত থাকত। পরে তারা খাদ্যের খোঁজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত। এই আদিমানবরা গাছের ফলমূল যেমন খেত, তেমনি তারা পশুর মাংসও খেত। আর এই খাদ্যের খোঁজে যখন তারা একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত তখন তাদের বিপদও ছিল পদে পদে। প্রাকৃতিক ঝড়-জল যেমন ছিল, তেমন ছিল হিংস্র বিভিন্ন ধরণের পশু ও পাখী। তাই পশু শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য তারা হাতিয়ার বা অস্ত্রের ব্যবহার করতে শিখেছিল। তারা পাথর, গাছের ডাল বা কাঠ ব্যবহার করত পশু শিকার করতে। অনেক সময় তারা পাহাড়ের ওপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে বড় বড় জন্তু শিকার করত। অনেকদিন ধরে আনন্দ করে তারা সে জন্তুর মাংস খেত।

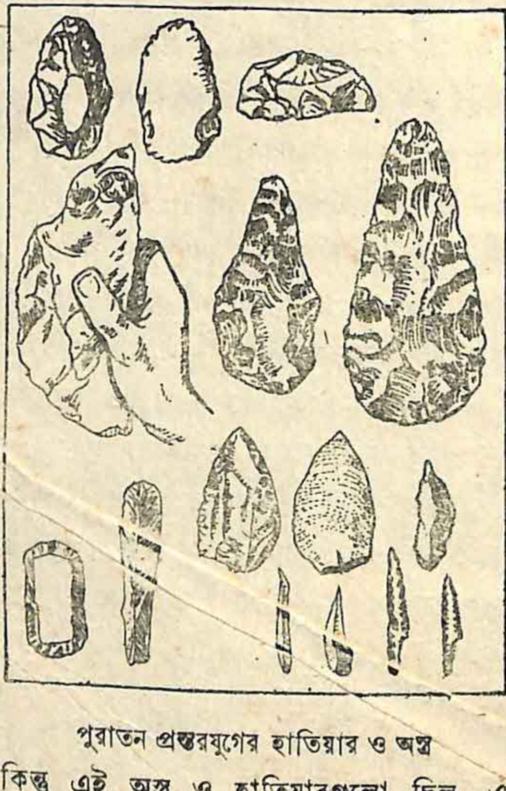
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাতন প্রস্তর যুগ

যত সময় এগিয়েছে মানুষের বুদ্ধির বিকাশও তত হয়েছে। আদিমানবরা তাদের জীবনকে আরও সহজ ও নিরাপদ করার চেষ্টা

করেছে। আদিমানবদের জীবনধারার অগ্রগতির এক বিশেষ অবস্থা হচ্ছে প্রস্তর যুগ। এই সময় মানুষ নানাপ্রকার হাতের কাজ করতে শিখেছিল। **তারা পশু শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য পাথর ও পাথরের টুকরোকেই হাতিয়ার বা অস্ত্র হিসাবে প্রথম ব্যবহার করতে শিখেছিল। তাই এই যুগের মানুষদের ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ।** এই পুরাতন প্রস্তরযুগের সূচনা হয়েছিল আনুমানিক পঁচিশ হাজার বছরেরও আগে।

পুরাতন প্রস্তরযুগের অস্ত্র ও হাতিয়ারঃ এই পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা চকমকির মত শক্ত পাথর যোগাড় করত। সেই শক্ত পাথরকে টুকরো টুকরো করত এবং তা দিয়ে তারা বানাতো হাতিয়ার



পুরাতন প্রস্তরযুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

ও অস্ত্র। কিন্তু এই অস্ত্র ও হাতিয়ারগুলো ছিল এবড়ো-খেবড়ো ও ভোঁতা। এই ধরণের অস্ত্র ও হাতিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন-

জায়গা থেকে আবিষ্কার করেছেন পণ্ডিতগণ। এই হাতিয়ার ও অস্ত্রগুলোর মধ্যে ছিল কিছু হাতুড়ি জাতীয় অস্ত্র। কিছু ছিল কোদালের ফলার মত দেখতে। আর ছিল কোন কিছু কাটবার এবং ফুটো করবার মত হাতিয়ার।

হাতিয়ার ও অস্ত্রের ব্যবহারঃ এই পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা বন্য জন্তুর মত ছিল অসভ্য। তারা আগুন জ্বালাতে জানত না। তারা গাছের ফলমূল ও কাঁচামাংস খেত। এই যুগের মানুষদের জীবন নিরাপদ ছিল না। তাদের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট কষ্ট করতে হতো। খাওয়ার সন্ধানে তারা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। তারা গাছের কোটর, জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের গুহায় থাকত। তাই তাদের বিপদ ছিল পদে পদে। একদিকে ছিল প্রাকৃতিক ঝড়-জল, অপরদিকে ছিল বন্য ও হিংস্র পশু-পাখী। এদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য তারা এই সমস্ত পাথরের অস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যবহার করত। আবার পশু শিকার করে মাংস খাওয়ার জন্য এই সমস্ত হাতিয়ার ও অস্ত্রের ব্যবহার করত। তারা আবার প্রতিদিনকার শিকারের অভিজ্ঞতা গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকে প্রকাশ করত। এর বিশেষ নমুনা পাওয়া গেছে স্পেনের আলতেমিয়া গুহায় আঁকা ছবিগুলোতে।

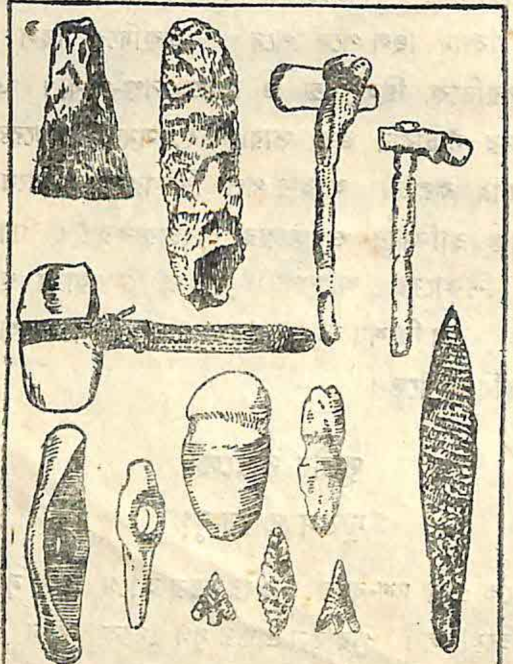
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন প্রস্তর যুগ

আজ থেকে প্রায় দশ-বারো হাজার বছর আগে এই নূতন প্রস্তর যুগের সূচনা হয়েছিল। পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে নূতন প্রস্তর যুগ আসতে কয়েক হাজার বছর লেগে গিয়েছিল। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ যেমন হয়েছে ধীরে ধীরে, তেমনি তারা নানা বিষয় জেনেছে এবং নানা বিষয় সম্বন্ধে তারা অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তারা লক্ষ্য করেছে সূর্যের নিয়মিত উদয় ও অস্ত। চারিপাশের পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে তারা নিজেদের মিশিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে।

এর ফলে ক্রমশঃ তাদের জীবনধারার পরিবর্তন হতে থাকে। মানুষ অসহায় অবস্থা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এবং আরও ভালভাবে বাঁচবার জন্য নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করেছে। তারা বানিয়েছে নূতন নূতন হাতিয়ার ও অস্ত্র। তারা পাথরকে ঘষে মেজে আরও সূক্ষ্ম ও মসৃণ করে নূতন নূতন হাতিয়ার ও অস্ত্র বানাতে লাগল। তাই এই যুগকে বলা হয় নূতন প্রস্তর যুগ।

নূতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্রঃ এই নূতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্রগুলো পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র-শস্ত্র থেকে আরও মসৃণ ও সূক্ষ্ম ছিল। পাথরের তৈরি ঐ সমস্ত হাতিয়ার ও অস্ত্রগুলোর ফলা যেমন ছিল ধারালো, তেমনি ছিল আরও উন্নত।



নূতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র

এই যুগের মানুষেরা বাঁশ থেকে তীর ও ধনুক তৈরি করত। এই হাতিয়ার ও অস্ত্রের সাহায্যে তারা সহজেই বন্য পশু শিকার করত। আবার আত্মরক্ষার কাজেও এইগুলো ছিল খুবই কার্যকরী।

এই সমস্ত হাতিয়ারগুলোর মধ্যে ছিল হাতুড়ি, বাটালি ও বর্শার ফলার মত জিনিস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষির আবিষ্কার ও খাদ্য উৎপাদন: এই নূতন প্রস্তর যুগের সব থেকে বড় ঘটনা কৃষির আবিষ্কার। এই 'কৃষি যুগে' মানুষ খাদ্য উৎপাদন শুরু করল চাষবাস করে। তারা উৎপাদন করতে লাগল গম, যব ও অন্যান্য ফসল ও শাক-সব্জী। তবে কৃষির আবিষ্কার কি করে হল তা ঠিক জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, পুরুষেরা শিকারে যেত, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করত। এই সমস্ত ফল খেয়ে তারা বীজ ফেলে দিত। বৃষ্টির জলে মাটিতে সে বীজ থেকে অঙ্কুর জন্মাতে ও গাছ হতে তারা দেখেছে। সম্ভবত এইভাবেই কৃষির আবিষ্কার হয়েছিল। এই কৃষিযুগের লোকেরা পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাত। এর ফলে তাদের জীবনে এল বিরাট পরিবর্তন। যে আদি মানুষগুলো খাদ্যের খোঁজে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াত, তারা এবার স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধতে শিখল। তারা পশুপালন করতে লাগল এবং ভালভাবে বাঁচবার জন্য নূতন নূতন জিনিস ও উপায় আবিষ্কার করতে লাগল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

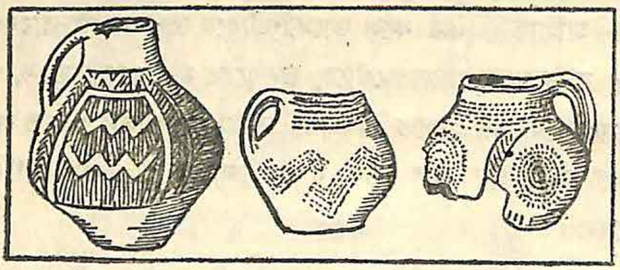
নূতন প্রস্তর যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন

কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তনের ফলে মানব ইতিহাসের ধারাই গেল পাল্টে। মানব সভ্যতার শুভ সূচনা দেখা গেল।

পশুপালন: নূতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা পশুপালন শুরু করেছিল। তারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন জন্তু সম্বন্ধে জেনেছে। তারা গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি পশু পালন করত। তারা এই সমস্ত পশুর মাংস খেত। এদের ছাল দিয়ে তৈরী পোশাক

পরত। পরে পালিত পশুর দুধ পান করাও শিখেছিল। কুকুর পাহারার কাজ করত। পশু শিকারেও কুকুরের সাহায্য নেওয়া হতো। এর পর আরো জানা যায় যে, তারা জিনিস পত্র বহনের জন্য এবং যাতায়াতের সুবিধের জন্য ঘোড়া পুষতো। পরে মধ্য এশিয়ার লোকেরা ষাঁড় ও গাধাকে প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল।

মাটির পাত্র ঃ নানা প্রয়োজনে এই যুগের মানুষেরা মাটির বাসন-কোসন তৈরী করতে আরম্ভ করে। প্রথম দিকে এই মাটির পাত্রগুলো তেমন ভাল ছিলনা। কিন্তু পরে তারা মাটি দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাসন-কোসন তৈরী করেছিল এবং এই পাত্রগুলোর গায়ে সুন্দর সুন্দর নক্সা ও ছবি আঁকা হতো। পুড়িয়ে এই সমস্ত বাসনকে শক্ত করা হতো। এই সমস্ত পাত্রের নমুনা পাওয়া গেছে বিভিন্ন কবর



নূতন প্রস্তর যুগের মাটির পাত্র

খুঁড়ে। এই সমস্ত মাটির পাত্রের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারত ও উত্তর প্রদেশে। এই যুগের মানুষরা চাকা জাতীয় সুন্দর সুন্দর মাটির জিনিসও তৈরী করত।

সূতির পোশাক ঃ এই যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল সূতি-বস্ত্রের আবিষ্কার। পশ্চিম এশিয়াতে এক ধরনের ঘাস জন্মাত। এই ঘাসের ফুলগুলো ছিল নীল। এই ঘাসের আঁশ থেকে সুতো বার করে কাপড় বোনা হতো। এই কাপড়ের পোশাক তারা পরত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

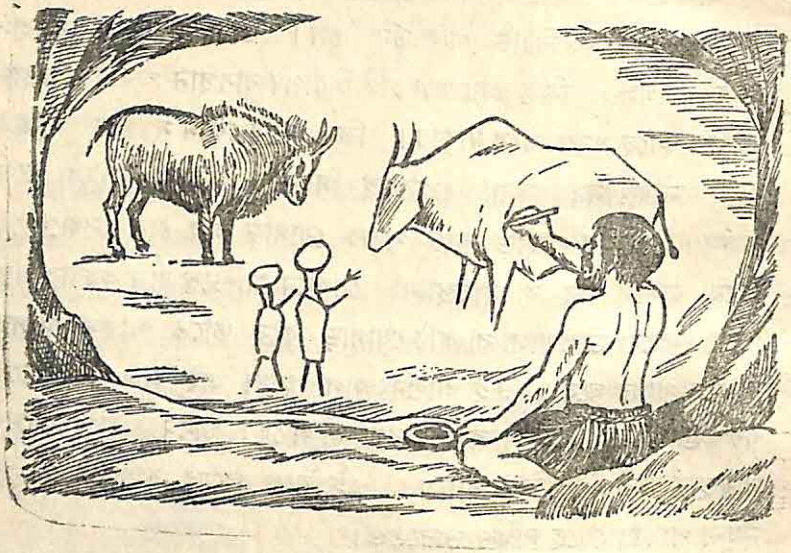
বাসস্থান, পরিবহণব্যবস্থা, শিল্পবোধ প্রভৃতি

বাসস্থান ঃ আগেই বলা হয়েছে যে, কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এল। তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু তার জন্য চাই নিরাপদ বাসস্থান। এই বাসস্থান তাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মানুষ কোন সমস্যার কাছেই মাথা নোয়ায়নি; তারা গুহাকেই নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গড়ে তুলল। আবার পাহাড় কেটে পাথর যোগাড় করে এনে সেগুলোকে দিয়ে বানাল ঘর বা বাসস্থান। সেখানে নিশ্চিন্তে বাস করবার জন্য তারা শুকনো ডালপালা বা কাঠ যোগাড় করে তাতে আগুন জ্বালত পাথরে পাথর ঘষে। এই আগুন জ্বালা হতো এই জন্য যে, যাতে বন্যজন্তুরা হঠাৎ এসে আক্রমণ করতে না পারে। ক্রমে তারা বসবাসের ব্যবস্থার আরও উন্নতি করেছিল। এই উন্নত ধরনের বাসস্থানের কিছু নমুনা পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতেও।

গোষ্ঠী ও পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ এই যুগের লোকেরা গৃহ পালিত পশুকে পরিবহণের কাজে ব্যবহার করত। ঘোড়ার পিঠে করে জিনিস পত্র এক-জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তারা তাড়াতাড়ি নিয়ে যেত।

আর এই পরিবহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস আরম্ভ করেছিল বলে। কৃষির আবিষ্কারের পর মানুষ এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। প্রথমে গড়ে উঠল কয়েকজনকে নিয়ে **পরিবার**। ক্রমে পরিবারের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকায় নূতন নূতন পরিবার গড়ে উঠল। **এইভাবে অনেক পরিবার কাছাকাছি ঘর বাড়ি বানিয়ে বাস করতে লাগল, এদের একত্রে বলা হয় গোষ্ঠী**। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যিনি বয়সে ও বুদ্ধিতে সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁকে **গোষ্ঠীপতি বা দলপতি** করা হতো। সকলেই তাঁর কথামত চলত। এইভাবে মানুষের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বোধ গড়ে উঠে এবং গ্রাম্য জীবনের সূচনা হয়।

শিল্পবোধঃ মানুষের শিল্পবোধ অনেক দিনের। পুরাতন প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রগুলোই তার প্রমাণ। সেখানে দেখা গেছে বন্যজন্তু ও গাছপালার ছবি। নূতন প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রগুলোতে যেমন



নূতন প্রস্তর যুগের গুহাচিত্র

নানা রকমের জন্তুর রঙিন ছবি পাওয়া গেছে তেমনি নানা মূর্তির ছবিও পাওয়া গেছে। সেই ছবিগুলোর মধ্যে অনেকগুলোকে দেব-দেবীর মূর্তি বলে মনে করা হয়। এই থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে, এই যুগের লোকেদের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসের সূচনা হয়েছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাষার ব্যবহার ও ধর্ম বিশ্বাস

ভাষার ব্যবহারঃ নূতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা আকার ইঙ্গিতের পরিবর্তে আস্তে আস্তে ভাষার ব্যবহার করতে শিখেছিল। সম্ভবত আট হাজার বছরেরও আগে মানুষ চলাফেরা, কাজ-কর্ম বা পরস্পরকে মনের ভাব বোঝাবার জন্য ভাষার ব্যবহার আরম্ভ করেছিল। কাজ-

কর্মের সময় ক্লান্ত হলে তারা মুখ দিয়ে বিচিত্র আওয়াজ করত। এ থেকেই আস্তে আস্তে মানুষের মুখে ভাষা ফুটেছিল। তাদের সেই প্রাচীন ভাষার পরিবর্তন হতে হতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মজার বিষয় হল এই যে, নূতন প্রস্তর যুগের লোকেরা লিখতে জানত না। নগর জীবন যখন শুরু হয়েছিল তখনই মানুষ অক্ষরের প্রচলন শিখেছিল।

ধর্ম বিশ্বাস ঃ নূতন প্রস্তর যুগের লোকেদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, সবকিছুর পেছনে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। এর কারণ অবশ্য তারা প্রকৃতির কাছে একদিকে ছিল অসহায়, আরেক দিকে ছিল সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তারা ঝড়, বন্যা, বিদ্যুতের চমকানি দেখে ভয় পেত। আবার অবাক হয়ে যেত একই নিয়মে সূর্য ও চন্দ্রের উদয় ও অস্ত দেখে। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে যেমন ভয় করত, তেমনি দেবতাজ্ঞানে পূজোও করত। বন্যা বা অনাবৃষ্টি হলে তারা ভাবত দেবতা রাগ করেছেন। তাই দেবতাকে খুশি করবার জন্য তারা গোষ্ঠীপতির আদেশ অনুসারে নরবলি পর্যন্ত দিত। আর পূজো পার্বনের আয়োজন যারা করত তারা পরিণত হল যাদুকর বা পুরোহিতে।

অনুশীলনী

১। (ক) আদিম মানব সম্বন্ধে কি জান?
   (খ) জাভা মানব ও পিকিং মানব বলতে কি বোঝ?
   (গ) আদি মানবরা কি কথা বলতে জানত?
   (ঘ) আদি মানবরা কি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খাদ্যের খোঁজে ঘুরে বেড়াত?

২। পিকিং মানবদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। (ক) পুরাতন প্রস্তর যুগ বলতে কি বোঝ?
   (খ) সে যুগের মানুষরা কি কি খেত?
   (গ) পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্র কি ধরনের ছিল?
   (ঘ) এই হাতিয়ারগুলো তারা কিসের জন্য ব্যবহার করত?

৪। (ক) নূতন প্রস্তর যুগের সূচনা আনুমানিক কত বছর আগে হয়েছিল ?
(খ) নূতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও অস্ত্রের কোন উন্নতি হয়েছিল কি ?
(গ) নূতন প্রস্তর যুগের সব থেকে বড় ঘটনা কি ?
(ঘ) কৃষি আবিষ্কারের ফলে কি মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছিল ?
(ঙ) এই যুগের লোকেরা কি খাবারের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াত ?

৫। পুরাতন প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। নূতন প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি রচনা লেখ।

৭। নূতন প্রস্তর যুগের লোকদের পশুপালন, মাটির পাত্র তৈরী ও সুতির পোশাক ব্যবহার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। নূতন প্রস্তর যুগের বাসস্থান, গোষ্ঠী ও পরিবহণ এবং শিল্পবোধ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। নূতন প্রস্তর যুগের ভাষার ব্যবহার ও ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১০। 'হ্যাঁ' বা 'না' লেখ :—
(ক) এপ্-ম্যানরা আমাদের পূর্বপুরুষ……… ।
(খ) জাভা মানব ও পিকিং মানবরা হাঁটতে পারত না……… ।
(গ) পিকিং মানবরা আগুনের ব্যবহার জানত……… ।
(ঘ) পুরাতন প্রস্তর যুগ আরম্ভ হয়েছিল দু'হাজার বছর আগে ……… ।
(ঙ) পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার খুব সূক্ষ্ম ছিল……… ।
(চ) নূতন প্রস্তর যুগের সবথেকে বড় ঘটনা ছিল কৃষির আবিষ্কার……… ।
(ছ) নূতন প্রস্তর যুগের লোকেরা কাপড় বুনতে জানত……… ।
(জ) নূতন প্রস্তর যুগের লোকেরা লিখতে জানত……… ।
(ঝ) নূতন প্রস্তর যুগে লোকেরা প্রকৃতিকে ভয় করত না……… ।

ধাতুর আবিষ্কারের ফলে প্রস্তর যুগের শেষ হল। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস নূতন মোড় নিল। উন্নততর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে নূতন নূতন আবিষ্কারে উৎসাহিত করল। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মত প্রাচীন ভারতেও এই ধাতুর আবিষ্কার হয়েছিল। এর ফলে গড়ে উঠল শিল্প ও বাণিজ্য। গড়ে উঠল নগর ও নাগরিক জীবন। এই তামা ও ব্রোঞ্জের যুগে মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা দেখা গিয়েছিল। তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈরী হয়েছিল ব্রোঞ্জধাতু। কি করে এই ধাতুর আবিষ্কার হয়েছিল তা ঠিক জানা যায় না। তবে আনুমানিক ছ'হাজার বছর আগে তামার আবিষ্কার হয়েছিল। আর ব্রোঞ্জ ছিল তামার থেকে শক্ত। তাই দিয়ে তারা কোদাল, তরবারি, ছোরা, বর্শা ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বানাত। তারা ব্রোঞ্জের গহনাও ব্যবহার করত। ব্রোঞ্জের নির্মিত কৃষির সাজ-সরঞ্জাম কৃষিরও উন্নতি ঘটিয়েছিল। এই সমস্ত জিনিসের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতের কোন কোন জায়গায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নগরের উৎপত্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর

কৃষির আবিষ্কারের ফলে কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রাম গড়ে উঠেছিল। যত সময় যেতে লাগল মানুষের জীবনধারাও পাল্টাতে লাগল। আস্তে আস্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে অনেক গ্রাম বড় হতে লাগল। নূতন নূতন পরিবারও এসে বাস করতে লাগল। ফলে নূতন নূতন প্রয়োজন দেখা দিল। তারা আরও ভালভাবে থাকবার আকাঙ্ক্ষায় নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করতে লাগল। আর ধাতুর আবিষ্কারের ফলে সকলেই আর চাষবাস নিয়ে মেতে রইল না। চাষবাসের সাথে সাথে শিল্প গড়ে উঠল। বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশায় লিপ্ত হল। দক্ষ কারিগর ও শিল্পীর

সুনামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা এসে ব্যবসার জায়গায় বাস করতে আরম্ভ করল। ব্যবসার উন্নতির ফলে সেখানে সম্পদও বাড়তে লাগল। দক্ষ কারিগর, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা অনেক অবসর সময় পেত। তারা আরো সুখ, আরাম ও বিলাসের জন্য নানান জিনিস তৈরী করতে লাগল। পাকাবাড়ি ও পাকা রাস্তা-ঘাট তৈরী হতে লাগল। বিভিন্ন পেশায় বহু লোক নিযুক্ত হতে লাগল। এইভাবে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নগর। আর এই নূতন সভ্যতাকে বলা হয় **নাগরিক সভ্যতা**।

বিভিন্ন-পেশায় পারদর্শিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিঃ এই নগরগুলোতে বহু লোক বাস করতে লাগল। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন চাহিদাও বাড়তে লাগল। ফলে এই নূতন নূতন চাহিদা অনুসারে নূতন নূতন পণ্য উৎপাদন হতে লাগল। এই সব পণ্য উৎপাদনে বিভিন্ন কারিগর ও শিল্পীর দক্ষতা ও পারদর্শিতা বাড়তে লাগল। চাষবাস ও পশু পালন ছাড়া ধাতুর আবিষ্কারের ফলে কারিগরী শিল্প গড়ে উঠল। কামার, কুমোর, তাঁতি ও অন্যান্য কাজে বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আরও মনোযোগ দিল এইসব শিল্পের উন্নতির জন্য। অনেকে দক্ষতা বৃদ্ধি করল তামা ও ব্রোঞ্জের নির্মিত বিভিন্ন জিনিস বানাতে। তারা নানান যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার আরও উন্নত পদ্ধতিতে বানাতে লাগল। এই সমস্ত দক্ষ কারিগর ও শিল্পীর নাম ছড়িয়ে পড়ল এবং এর ফলে এদের চাহিদাও বেড়ে গেল। এইভাবে এদের দক্ষতা আরও বেড়ে গেল। এক একজন শিল্পী ও কারিগর এক এক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করল। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটতে লাগল এবং মানব সভ্যতার গতি আরো বেড়ে গেল। আর এই সমস্ত নূতন নূতন জিনিসগুলোর মধ্যে ছিল ব্রোঞ্জ, সোনা-রূপোর অলঙ্কার, নানাপ্রকার প্রসাধন বা বিলাসদ্রব্য, জুতো, কাপড় সুন্দর সুন্দর মাটির বাসন, মূর্তি প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, সামাজিক জীবনধারার রূপান্তর

আগেই বলা হয়েছে যে, ধাতুর আবিষ্কারের ফলে চাষবাসের উন্নতি হয়েছিল এবং বিভিন্ন কারিগরী শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। এর ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল সঞ্চয় করতে লাগল সে যুগের লোকেরা। আর কারিগরী শিল্পের উন্নতি হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটল। প্রথমে এই ব্যবসা শুরু হয়েছিল বিনিময় পদ্ধতিতে। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের পরিবর্তে অন্যের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস বিনিময়ের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হত। কিন্তু কাজের উন্নতি, কারিগরী শিল্পের উন্নতি ও এর ফলে ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার জন্য কিছু লোকের অবস্থা খুব ভাল হল। এই অবস্থার আরো পরিবর্তন হল বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তে সোনা-রূপো ও অন্যান্য ধাতুর বিনিময়ে জিনিসের কেনা-বেচা শুরু হওয়ায়। ফলে সমাজে দেখা দিল একশ্রেণীর মধ্যে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস। দক্ষ শিল্পী ও কারিগর প্রচুর সম্পদের অধিকারী হল। আর অন্যরা রয়ে গেল গরীব। তাই এই সময় থেকেই সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোষ্ঠীসংঘাত ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থা

গোষ্ঠী-সংঘাতঃ ছোট ছোট নগর ও আশ-পাশের গ্রাম-গুলোকে কেন্দ্র করে একাধিক গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করত। আর এই নগরগুলো ছিল প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বাধীন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিতে লাগল। এর ফলে দেখা দিল গোষ্ঠীসংঘাত। এক গোষ্ঠীর লোকেরা অন্য জায়গায় গিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে লাগলে জটিলতার সৃষ্টি হল। সবলেরা

দুর্বলদের পরাজিত করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে লাগল। আবার দেখা গেল উন্নত গ্রাম ও নগরে বাইরে থেকে যাযাবর গোষ্ঠীর বার বার আক্রমণ।

রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থা : এই ছোট ছোট নগরগুলো ও তার কাছাকাছি গ্রামগুলোকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের প্রথম সৃষ্টি দেখা গিয়েছিল। এই অঞ্চল সমূহের জনসমষ্টি শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করবার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছিল। আর এই নগররাজ্যগুলো সেকালে ছিল অনেকটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বাধীন। নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনকার্যে সকলেই কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করতে লাগল। বাইরের আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের অঞ্চলকে বাঁচাবার দায়িত্বও এদের উপর এসে পড়ল। এইভাবে ছোট ছোট নগর-রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থা গড়ে উঠল। সেখানে সকলের যৌথ দায়িত্ববোধ দেখা গিয়েছিল। তবে তাদের মধ্যে বুদ্ধি ও ক্ষমতায় যে শ্রেষ্ঠ ছিল, আস্তে আস্তে তাকে সকলে নেতা হিসেবে মানতে লাগল। সকলে তার আদেশ মেনে চলত এবং ক্রমশঃ তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এই ভাবেই রাজার আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হতে অনেক সময় লেগেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নদী উপত্যকায় মানবসভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ

কৃষি ও ধাতুর আবিষ্কার মানব সভ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য করল। কিন্তু এই মানবসভ্যতার বিশেষ উন্নত অবস্থা দেখা গেল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। এমনি করেই আমরা দেখেছি নীলনদের ধারে গড়ে ওঠা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় প্রাচীন চীন সভ্যতা ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় সিন্ধু সভ্যতা। নদীর ধারে ধারে এই প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল কেন তার অনেক কারণ ছিল। প্রথমমতঃ, মানুষের বেঁচে থাকার

জন্য প্রধান যে জিনিস তা হল খাদ্য ও পানীয়। এই খাদ্য ও পানীয় সহজ ছিল নদীর উপত্যকায়। এই উপত্যকাগুলোতে বন্যার ফলে পলি জমে জমি খুব উর্বর হয়ে উঠেছিল। চাষের জন্য জল পাওয়াও খুব সহজ ছিল এই নদীর ধারে। ফলে এখানে চাষবাস করে প্রচুর ফসল ফলান সম্ভব হতো। দ্বিতীয়তঃ, এই উপত্যকার উর্বর জমিতে প্রচুর ঘাস জন্মাত। ফলে গৃহপালিত পশুর খাবারের অভাব হতো না। তৃতীয়তঃ, বাসস্থানের সুবিধে ছিল। এই উপত্যকায় ঘাস যেমন ছিল, তেমনি বন জঙ্গলও ছিল। ঘর-বাড়ি তৈরীরও সহজ সুযোগ ছিল এখানে। এছাড়া নদীর পলিমাটি থেকে সহজেই ইঁট বানিয়ে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে তা দিয়ে পাকাবাড়ি, রাস্তাঘাট, নর্দমা, জলাশয় প্রভৃতি তৈরী করার সুবিধে ছিল। এর ফলে সুন্দর সুন্দর নগর গড়ে উঠেছিল। চতুর্থতঃ, নদীর ধারে প্রচুর বন-জঙ্গল ছিল। সেখান থেকে পশুরা নদীতে জল খেতে আসত। কাজেই মাংসের জন্য পশুশিকারও সহজ ছিল। পঞ্চমতঃ, গাছের ফলমূলও পাওয়া যেত প্রচুর। ষষ্ঠতঃ, এখানে উর্বর জমিতে চাষ করে প্রচুর ফসল ও শাক-সব্জী পাওয়া যেত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল, গম, যব ও অন্যান্য জিনিস বিনিময় পদ্ধতিতে ব্যবসার জন্য সহায়ক ছিল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠল। পরে ধাতুর আবিষ্কারের ফলে এই ব্যবসার আরও উন্নতি হল। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ব্যবসার জন্য জিনিসপত্র নিয়ে যেতে যানবাহনের প্রয়োজন হতো। এই যাতায়াতের সব থেকে ভাল ব্যবস্থা ছিল জলপথ ও নৌকা। নৌকার সাহায্যে অনেক দূরে দূরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও আরো উন্নতি হল। সপ্তমতঃ, খাওয়া-থাকার সুবিধে ও ব্যবসার উন্নতির ফলে এখানকার লোকেদের অবস্থা ভাল হল। তারা প্রচুর অবসর পেতে লাগল। এই অবসর সময়ে তারা নানান চিন্তা করতে লাগল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তাদের মধ্যে ভাবাবেগও আসতে লাগল।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 6.7.89
S.C.E.R.T., West Bengal Library

ফলে এই চিন্তাধারা ও ভাবাবেগ থেকে সৃষ্টি হল শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিক। তারা সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে শিখল। গড়ে উঠল মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য শিল্প, স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি। আরও চেষ্টা চলল নানান জিনিস আবিষ্কারের। মানুষের সভ্যতা ক্রমশঃ উন্নত হতে লাগল। মানুষ আরও আরামে ও সুখে বাস করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। মানুষের উন্নততর জীবনধারা গড়ে উঠল। আর সমাজে দেখা দিল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্য।

অনুশীলনী

১। (ক) মানুষ কোন ধাতু প্রথমে আবিষ্কার করেছিল? অমার আবিষ্কার কখন হয়েছিল?

(খ) ব্রোঞ্জ ধাতু কি করে তৈরী হতো?

(গ) ধাতুর আবিষ্কারের ফলে কোন্ যুগের শেষ হল?

(ঘ) ভারতেও কি এই ধাতুর আবিষ্কার প্রাচীনকালে হয়েছিল?

২। শহর বা নগর কি করে গড়ে উঠল?

৩। মানুষ কি নূতন নূতন জিনিস তৈরী করতে লাগল নূতন নূতন উপায়ে?

৪। শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা বাড়ানো দরকার হয়েছিল কি?

৫। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি কি করে হল?

৬। সমাজ জীবনে কি পরিবর্তন দেখা গেল?

৭। সমাজে শ্রেণী-বিভাগ গড়ে উঠেছিল কি?

৮। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলো কেন?

৯। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান?

১০। নদীর ধারে ধারে কেন সভ্যতা গড়ে উঠল?

১১। ধাতুর তৈরী জিনিসের নিদর্শন প্রথম কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?

১২। 'হ্যাঁ' বা 'না' বল:—

(ক) ধাতুর আবিষ্কারের ফলে প্রস্তর যুগের শেষ হল………।

(খ) ভারতেও এই ধাতুর আবিষ্কার হয়েছিল………।

(গ) ধাতু আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতার কোন পরিবর্তন আসেনি……।

(ঘ) ব্রোঞ্জের গহনাও সেই যুগের লোকেরা ব্যবহার করত………।

(ঙ) বিনিময় পদ্ধতিতে সে যুগে ব্যবসা আরম্ভ হয়েছিল………।

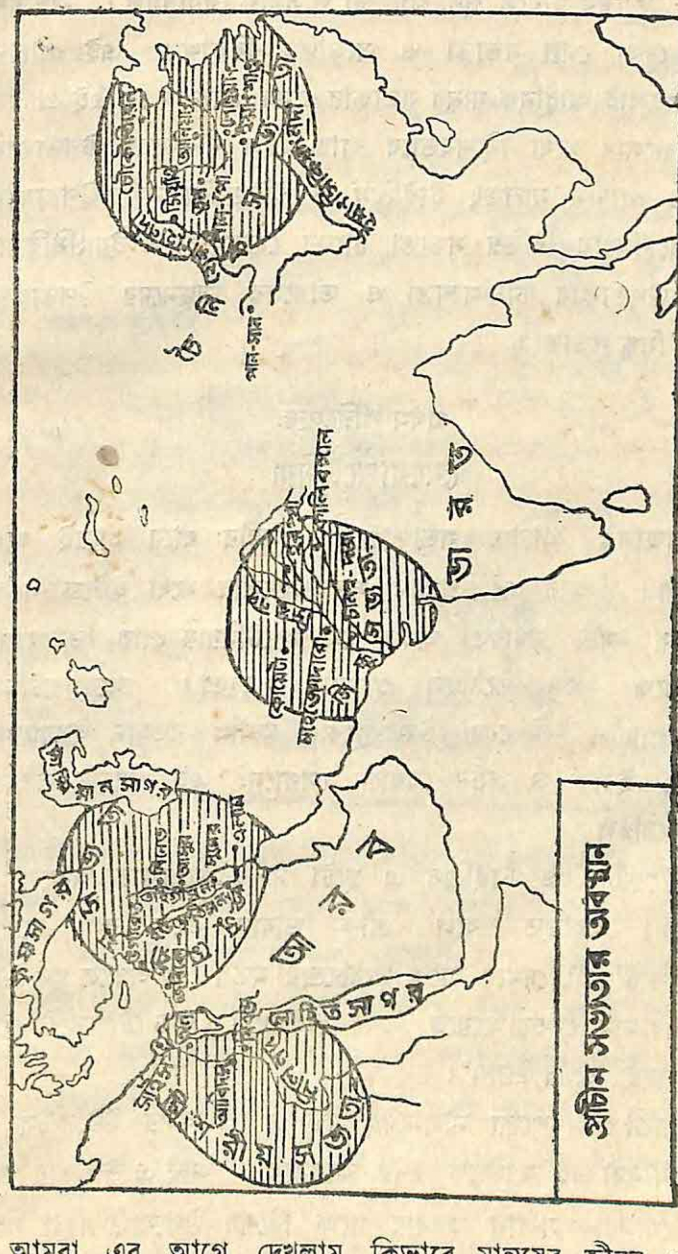
(চ) গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে কোন লড়াই সেই সময় দেখা যায় নি………।

(ছ) নদীর ধারে ধারে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল………।

———

প্রাচীন সভ্যতা

[৩০০০ খ্রীঃ পূঃ—১৫০০ খ্রীঃ পূঃ]



প্রাচীন সভ্যতার অবস্থান

আমরা এর আগে দেখলাম কিভাবে মানুষের জীবন ধারার ক্রমপরিবর্তন হল, কি ভাবে মানুষ সভ্যতা গড়ে তুলল নদীর ধারে

ধারে, গড়ে উঠল গ্রাম ও নগর। মানুষের জীবন ধারা বেশ উন্নত হয়ে উঠল। তাদের জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি দেখা দিল। মানুষের সমাজে দেখা গেল সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ। এই প্রাচীন সভ্যতাগুলোই আধুনিক মানব সভ্যতার প্রথম সোপান। এই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত ছিল নীলনদের উপত্যকায় মিশরের প্রাচীন সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ায় বিভিন্ন সভ্যতা, চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় চীন-সভ্যতা ও ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

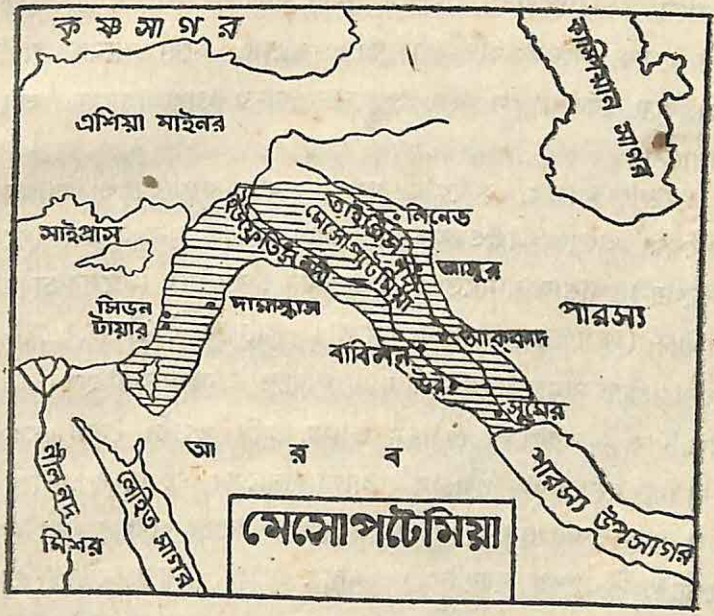
মেসোপটেমিয়া

অবস্থান ঃ প্রাচীন সভ্যতাগুলো নদীর ধারে ধারেই গড়ে উঠেছিল। আর এই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল মেসোপটেমিয়ায় প্রায় তিনহাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় সভ্যতা। মেসোপটেমিয়া হচ্ছে প্রাচীন মিশরের উত্তর-পূর্বে। অর্থাৎ বর্তমান ইসরায়েল, সিরিয়া, ইরাক ও জর্ডন যেখানে সেখানেই এই প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস এ দুটো নদীর মধ্যেকার অঞ্চলে এ জায়গাটা অবস্থিত বলে গ্রীক ভাষায় একে বলা হয়েছে 'মেসোপটেমিয়া', দেখতে যাকে 'অর্ধচন্দ্রের' মত। এ অঞ্চলে খুব উর্বর তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'উর্বর অর্ধচন্দ্র'। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে একে বলা হয়েছে 'স্বর্গের উদ্যান'।

উর্বরতা ঃ মিশরের নীলনদের মত এ অঞ্চলের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী এই অঞ্চলকে উর্বর করেছিল। আর এ উর্বরতার জন্য এবং এখানটা বস-বাস করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল বলে অনেক গোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বস-বাস করবার জন্য এসেছে।

আর এ সমস্ত লোকেরাই এখানে গড়ে তুলেছিল সুপ্রাচীন মানব সভ্যতা প্রায় ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যারা এখানে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তাদের বলা হয় সুমেরীয়। তারপর এখানে গড়ে উঠেছে ব্যাবিলনীয়দের সভ্যতা, এ্যাসিরীয়দের সভ্যতা এবং হিব্রু বা ইহুদীদের সভ্যতা।



শস্য উৎপাদন ঃ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর প্লাবনের ফলে এ অঞ্চল খুব উর্বর ছিল। তার ফলে এখানে কৃষিকার্য গড়ে উঠেছিল। এখানকার বেশীর ভাগ লোকই চাষ করত। তারা প্রচুর শস্য ফলাত। তারা প্রচুর পরিমাণে উন্নত ধরনের বার্লি, শাকসব্জী, গম, ফল প্রভৃতি উৎপন্ন করত। ফলে এখানে খাবার ছিল প্রচুর। সুমেরীয়গণ জমিকে সমানভাবে ভাগ করে চাষ করত। কারণ এরা মনে করত জমি ঈশ্বরের এবং জমিতে সকলের সমান অধিকার আছে।

বন্যা ও তার প্রতিকার ঃ অতিবৃষ্টির জন্য নদীগুলোর জল বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে বন্যা দেখা দিত। বন্যার ফলে পলিমাটি পড়ে

জমিগুলো যেমন উর্বর হয়ে উঠত, তেমনি প্রচুর শস্য সহজেই জন্মাত। আবার বন্যার ফলে ক্ষতিও হত। বন্যার হাত থেকে শস্য ও ঘর-বাড়ি বাঁচানোর জন্য এরা নানাপ্রকার বাঁধ দিত। জলাধারও তৈরী করে বেশী জল আটকে রাখত। শুকনোর সময় সে জল তারা চাষের কাজে লাগাতো। নদীর ধার যেখানে নীচু সেখানে এরা বাঁধ দিয়ে রাখত। এরা বন্যার প্রকোপ কমানোর জন্য নদী থেকে অনেক খাল কাটতো। খালের মধ্যে অনেক বারতি জল বয়ে যেত। সে জল শুকনোর সময় তারা চাষের কাজে লাগাতো।

অন্যান্য কাজঃ কৃষিকাজ তাদের প্রধান কাজ হলেও এখানকার লোকেরা অন্যান্য কাজও করত। তারা কাপড় বুনতো এবং পশমের (উলের) পোশাক বানাতো। এরা সুন্দর সুন্দর শাল (উলের চাদর), গালিচা (কার্পেট) ইত্যাদি বুনতো। অনেকে তৈরী করত সোনার গহনা, তাতে নানারকমের দামী দামী পাথরও ব্যবহার করা হত। এরা হাড় দিয়ে নানারকমের সৌখিন জিনিস, মূর্তি প্রভৃতি তৈরী করত। এরা বিশেষভাবে দক্ষ ছিল রথ বা গাড়ী বানাতে। এই রথের চাকাগুলো ছিল খুব সুন্দর ও সূক্ষ্ম। ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত্রের ব্যবহার এরা করত যুদ্ধের ও শিকারের সময়। এরা মাদুর, চাটাই, চেয়ার, টেবিল তৈরী করতে জানত। এরা মাটির বাসনপত্র ও নানা প্রকারের মাটির জিনিস তৈরী করত। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে যে, এরা বাসনের মধ্যে নানা ধরনের কারুকার্য করত। এদের অনেকগুলো বাসনও পাওয়া গিয়েছে।

সুমেরীয়দের কৃতিত্বঃ এই মেসোপটেমিয়ায় সব থেকে আগে যারা সুন্দর নগর-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তাদের সভ্যতাকে বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতা। এরা দেখতে ফর্সা ও সুন্দর ছিল। অনেকে মনে করেন যে, এরা ছিল আর্যজাতি। এরা মধ্য এশিয়া থেকে মেসোপটেমিয়ায় এসেছিল। এদের মাথার চুল খুব কাল ছিল। এ জন্য এদের বলা হত সুমার। আবার এও বলা হয় যে,

এরা রাজধানী স্থাপন করেছিল সুমারে। সে জন্য তাদের সভ্যতাকে সুমেরীয় সভ্যতা বলা হয়। যা হোক, এই সুমেরীয়গণ ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল মেসোপটেমিয়ায়।

এই সুমেরীয়গণ নগর-রাষ্ট্র গড়ে ছিল। নগর এবং গ্রামগুলো ছিল সব দিক থেকে খুব উন্নত। প্রথমে তারা গড়ে তুলেছিল বাঁশ জাতীয় বড় বড় ঘাসের বাড়ি। সারি সারি এ বাড়িগুলো দেখতে বেশ সুন্দর ছিল। খিলেনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। আর দেওয়ালগুলো কাদা দিয়ে প্লাষ্টার করা হত। কিন্তু আস্তে আস্তে পাকা বাড়ি তৈরী করা হল রোদে পোড়ানো ইঁট দিয়ে। এভাবে অনেক নগর বা শহর গড়ে উঠল। রাস্তাঘাট পাকা হল। বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল জমকালো কেল্লা বা দুর্গ। অনেক বড় বড় এবং উঁচু উঁচু বাড়ি ছিল।

সুমার ও নিপ্পুর-এ দুটো শহর ছিল সব থেকে জমকালো। এখানে রোদে পোড়া ইঁট দিয়ে অনেক উঁচু উঁচু মন্দির তৈরী করা হয়েছিল। এ মন্দিরগুলো থাকে থাকে উঁচু করা হয়েছিল। এগুলোকে বলা হত জিগুরাত। এগুলো উঁচু কেল্লার মত দেখতে ছিল। এ মন্দিরগুলোতে পূজোর ঘর থাকত। আর থাকত ভাঁড়ার ঘর ও পাঠশালা। কড়ি-বরগা দিয়ে ছাদ তৈরী করা হত পাকা বাড়ির।

সুমেরীয়রা কাঁচা জমাটের ওপর চিত্রাঙ্কন করত। এমন অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। আবার তারা সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে পাথরের চাদরের ওপর খোদাই করে বা পাথর কেটে মূর্তি বা নানারকমের শিল্প গড়তে শিখেছিল। একে বলে ভাস্কর্যশিল্প।

আবার এও দেখা গেছে যে, তারা ধাতু গলিয়েও শোধন করে নানা ধরনের যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরী করত। আবার গহনাও বানাত। এ যুগে ব্রোঞ্জের ব্যবহার দেখা গেছে।

যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। তবে কতটা পর্যন্ত তাদের

ব্যবসা প্রসারিত ছিল ঠিক জানা যায় না। নৌ-পথের প্রচলনও ছিল।

সুমেরীয়গণের মধ্যে লেখাপড়ার ও বিজ্ঞান চর্চার প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ তাদের প্রচলিত লেখাগুলো ছিল এক বিশেষ ধরনের। নরুণের মত কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে তারা লিখত। সেগুলো প্রথমে দেখতে ছিল ছবির মত। তারপর আরও উন্নত হয়ে সেগুলো দেখতে



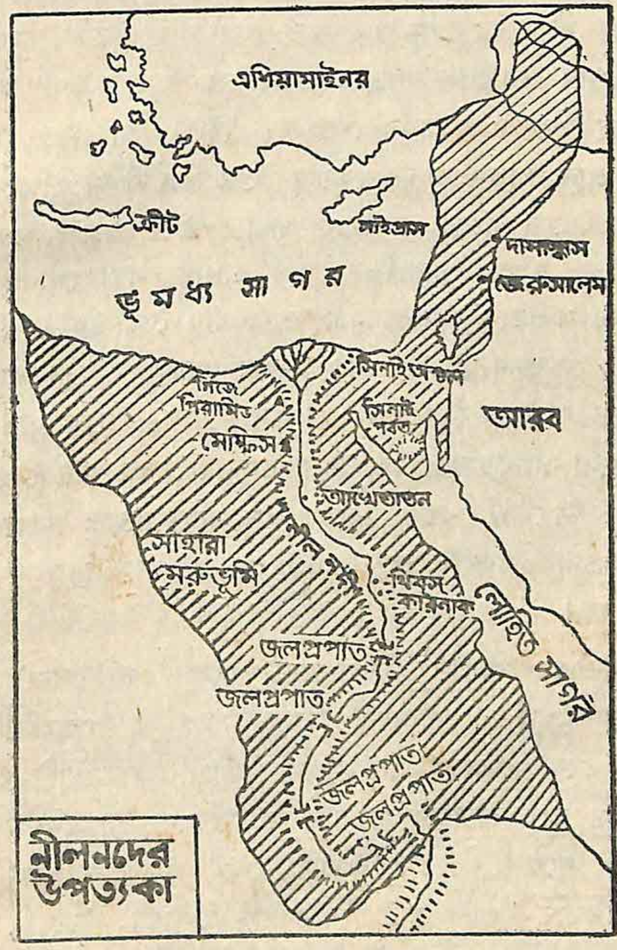
কিউনিফর্ম অক্ষর

হয় ধাতু খণ্ডের মত। সেজন্য এই অক্ষরগুলোকে বলা হয় 'কিউনিফর্ম' বা কীলাকৃতি। এগুলো ছিল এক একটা চিহ্নস্বরূপ। এক একটা চিহ্ন এক এক উচ্চারণ বোঝাত। এ চিহ্নগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় চারশ। এরা লিখত কিন্তু কাদা মাটির জমাটের ওপর। লেখার পর সেটাকে পোড়ান হত। উর্দু ভাষার মত সুমেরীয়রা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখত। তারা সংখ্যারও আবিষ্কার করেছিল। ৬০ সংখ্যাটা তারা ব্যবহার করত সময়ের পরিমাপ ঠিক করতে। আজও কিন্তু এর গুরুত্ব আছে সময়ের পরিমাপে। আমরা তাদের কাছ থেকে বৃত্তের ৩৬০ ডিগ্রির হিসাবও পেয়েছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশর

প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে মিশরের সভ্যতা ছিল অত্যন্ত উন্নত। মিশর হচ্ছে মরুভূমি ঘেরা উত্তর আফ্রিকার পূর্বদিকে। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নীলনদ।



অবস্থান ও জমির বৈশিষ্ট্য : মিশরের পশ্চিমে বিরাট সাহারা মরুভূমি আছে। কিন্তু মিশর নীলনদের জন্য উর্বর, সবুজ গাছ-পালা ও শস্যে ভরা। নীলনদ মিশরের প্রাণ। মিশরের অনেক স্থানে কিছু কিছু মরুভূমি অঞ্চলও আছে। কিন্তু তবুও মিশরের

মাটি বিশেষভাবে উর্বর। প্রতিবছর নীলনদের বন্যায় মিশরের বিরাট অঞ্চল প্লাবিত হত। আর বন্যায় পলি পড়ে মাটি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত উর্বর। সহজেই এখানে চাষ-বাস হত এবং প্রচুর শাক-সব্জী, শস্য ও তুলো জন্মাত নীল নদের দুই তীরে। ধান, যব, গম ও অন্যান্য ফসল প্রচুর হত। তাই গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেছেন—"মিশর নীলনদের দান"। আর কাছাকাছি উত্তরে ভূমধ্যসাগর, উত্তর পূর্বে লোহিত সাগর এবং পশ্চিমে মরুভূমি থাকায় মিশর বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। জমি উর্বর থাকায় ও ফসল প্রচুর থাকায় তাদের খাওয়ার চিন্তাও ছিল না। এর ফলে তারা উন্নত ধরনের চিন্তা করত। মাথা খাটিয়ে তাদের সভ্যতাকে খুব উন্নত করতে পেরেছিল। তাই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে মিশরের সভ্যতার এত নাম। তাঁরা বাঁধ তৈরী করে জল ধরে রাখত শুকনোর সময়ে সেচ দেবার জন্য। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সঙ্গে খাল যোগাযোগ ছিল। যখন বন্যা তাদের জমিগুলো প্লাবিত করে দিত, তারা তখন বিভিন্ন উপায়ে সেগুলোকে চাষের উপযোগী করে তুলত। সে ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে কোণ এবং গণনার ব্যবস্থাও ছিল। এর থেকেই প্রথম জ্যামিতি শাস্ত্রের সূচনা হয়।

ফারাও: প্রাচীন মিশরে অনেকগুলো গোষ্ঠী বাস করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকদের নিজস্ব সাঙ্কেতিক পশুমূর্তি ছিল। তারা একে দেবতা বলে পূজো করত। এক গোষ্ঠী অপরকে পরাজিত করে তাদেরকে বাধ্য করত নিজেদের পশুমূর্তিকে দেবতা হিসাবে পূজো করতে। এভাবে শেষে উত্তর ও দক্ষিণ মিশর শাসন করতে থাকে দুটো শক্তিশালী গোষ্ঠী। উত্তরের গোষ্ঠীর লোকদের সাঙ্কেতিক পশুমূর্তি ছিল সাপ। আর দক্ষিণের লোকদের সাঙ্কেতিক পশু মূর্তি ছিল শকুন। প্রায় ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই উভয় অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করেন উত্তর অঞ্চলের শাসক মেনেস। তিনি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গড়ে তোলেন। রাজধানী স্থাপন

করেন মেমফিসে। তিনিই ছিলেন মিশরের প্রথম শাসক বা 'ফারাও'।

'ফারাও' শব্দের অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিরাট প্রাসাদে



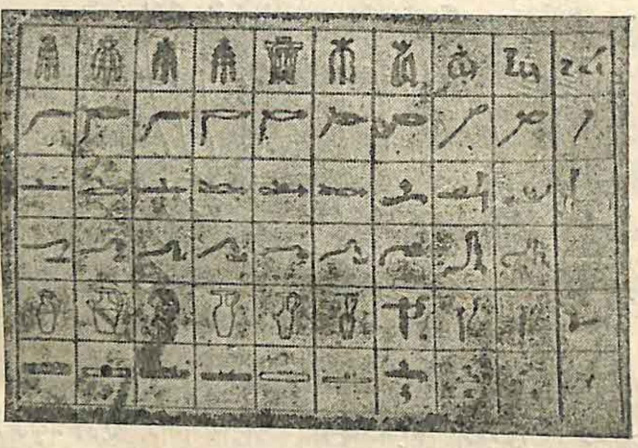
ফারাও

বাস করেন। মেনেস ছিলেন প্রথম ফারাও যিনি দুটো মুকুট মাথায় পড়তেন। উত্তরাঞ্চলের মুকুট ছিল লাল, আর দক্ষিণ অঞ্চলের মুকুট ছিল সাদা। আবার উভয় অঞ্চলের সাঙ্কেতিক পশুমূর্তি সাপ ও শকুনকে তিনি রেখেছিলেন। এই ফারাওগণ এই সময় থেকেই মিশরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাদের দেবতার মত পূজো করা হত। মেনেসের বংশধরেরা ২৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত মিশর শাসন করেছিল।

পুরোহিত: প্রাচীন মিশরে সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল: (১) পুরোহিত, (২) অভিজাত ও (৩) সাধারণ লোক। এদের মধ্যে পুরোহিতদের ক্ষমতা ছিল সব থেকে বেশী। মিশরের

লোকেরা ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন ছিল। সমাজে পুরোহিতদের সম্মানও ছিল সব থেকে বেশী। ফারাও তাদের সম্মান করতেন এবং খাতির করতেন। অভিজাতদের থেকেও তারা বেশী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। পুরোহিতরা সরকারী কাজের হিসাবও রাখতেন।

অক্ষরঃ মিশরের সুপ্রাচীন সভ্যতার অনেক কিছু আমরা জানতে পারি তাদের লেখা থেকে। তারাই সম্ভবত প্রথম লেখার জন্য অক্ষর আবিষ্কার করেছিল। ফারাওদের সময় তারা অদ্ভুত ধরনের লেখার পদ্ধতি শুরু করে। পরে তা বিশেষভাবে উন্নত হয়। প্রথমে তাদের অক্ষরগুলো ছিল ছবি আকারের। পরে আস্তে আস্তে চিহ্নের আকার ধারণ করে। এ অক্ষরকে বলা হয়



হায়ারোগ্লাইফিক অক্ষর

হায়ারোগ্লাইফিক। একটা জিনিসের চিত্রকে শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হত। তার দ্বারা একটা ধারণাকে বোঝানো হত। তারপর চব্বিশটা অক্ষরের আবিষ্কার হয়। এ অক্ষরগুলোকে ছবির সাথে ব্যবহার করা হত। প্রথমে পাথরের বা কাদার চাদরের গায়ে লেখা হত। পরে তারা ঘাস থেকে কাগজ আবিষ্কার করে তার ওপর লিখত নলের কলম ও কালি দিয়ে। এ কাগজকে বলা হয় পেপিরাস। যার থেকে বোধহয় পেপার শব্দটি এসেছে। এ ঘাস প্রচুর জন্মাত নীল নদের ধারে।

মিশরীয়দের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বেশ উন্নতি দেখা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক কবি, সাহিত্যিকও ছিল। অনেক কবিতা, স্তোত্র, সরকারী কাজের অনেক লিখিত নমুনা পাওয়া গেছে। অনেক সরকারী চিঠি-পত্র ও অন্যান্য দেশকে পাঠানো চিঠিও পাওয়া গেছে। এ চিঠিগুলো সে যুগের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে।

কর আদায়কারী: সরকারী কাগজপত্র যেমন ছিল এবং সরকারী আদেশ ও কাজ যেমন লিখে রাখা হত, তেমনি কর আদায়ের ব্যবস্থাও ছিল। কর আদায়ের জন্য সরকারী কর্মচারী ছিল। রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও উন্নত ধরনের ছিল। কর আদায়কারিরা যাতে সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হত।

সামরিক বাহিনী: রাজ্যের আরেকটি বিষয় ছিল সামরিক দিক। নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল সৈন্যদের মধ্যে। যদিও মিশরীয়দের আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বিশেষ ছিল না, কিন্তু তবুও ফারাও-এর সেনাবাহিনী ছিল। শ্রমিকরা প্রয়োজনে সৈনিকের কাজ করত। তাদের যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত। অনেকে মনে করেন মিশরীয়দের নৌবাহিনীও ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য: প্রাচীন যুগে মিশরীয়রা নৌবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য নানারকম শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। প্রথম দিকে বিনিময় পদ্ধতি প্রচলন থাকলেও পরে সোনা ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহারও প্রচলিত হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে। তারা বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। নিজেদের উন্নত ধরনের শিল্প, খাদ্য, তুলো তারা অন্যান্য দেশে রপ্তানি করত। অনেক জিনিস তারা আমদানীও করত। দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থলপথে এবং জলপথে চলতো। বিদেশের সাথে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য নেকো নামে এক ফারাও সুয়েজ খালের মত একটা খাল কাটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটা বড় খাল কেটে তারই

সাহায্যে নীলনদের সঙ্গে লোহিত-সাগরকে যুক্ত করা যাতে আরব এবং অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটান যায়। এছাড়া লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটিয়েছিল।

পিরামিড ঃ 'মিশর ছিল পিরামিডের দেশ' বলে পরিচিত। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার একটা বড় নিদর্শন এ পিরামিডগুলো। বর্তমানকালে মিশরের রাজধানী কাইরোর কাছে নীলনদের পশ্চিম পারে গিজে নামক স্থানে পাথরের তৈরী বিশালাকার পিরামিড-গুলো পৃথিবীর অতি আশ্চর্য বস্তু। স্থাপত্য শিল্পে তারা কত উন্নত ছিল এ পিরামিডগুলো তার নিদর্শন। প্রায় পাঁচ হাজার



নীলনদ ও পিরামিড

বছর আগে তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফারাও যোসেরের জন্য প্রথম পিরামিড তৈরী করা হয় সাক্কারাতে। বড় তিনটি বিখ্যাত পিরামিড গড়া হয়েছিল চতুর্থ রাজবংশের ফারাওদের সময়ে। এ

ফারাওগণের মিশরীয় নাম ছিল খুফু, খাফ্রে ও মেন-কু-রে। খুফু গিজেতে যে বিশাল পিরামিড তৈরী করিয়েছিলেন প্রায় তের একর জমিতে তা ছিল পাঁচশ ফুট উঁচু। হাজার হাজার লোক প্রায় বিশ বছর ধরে পরিশ্রম করে এ পিরামিডটা তৈরী করেছিল ২৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। পিরামিডগুলো ছিল ফারাওদের কবর। এগুলো তৈরী হতো সবুজ মাঠের শেষে মরুভূমি যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানে। পাহাড় থেকে তামার ছুরি ও ছেনী দিয়ে পাথর কেটে তারা উঁচু উঁচু পিরামিড তৈরী করত। অত উঁচুতে পাথরগুলো তুললো কি করে তা ভেবে আজও বিস্মিত হতে হয়।

এ পিরামিডগুলোতে ফারাওদের মৃতদেহগুলো রাখা হত। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর ফারাওদের আত্মা ততদিন স্বর্গে বাস করবে যতদিন তাদের দেহ রক্ষা করা যাবে। পরের জীবনের জন্য ফারাও যা যা ভাল বাসতেন সে সমস্ত জিনিস রেখে দেওয়া হত মৃত দেহের কাছে পিরামিডের মধ্যে। ফারাওদের মৃতদেহ কবরের ভিতরে রাখার আগে তাকে কবরে এক অদ্ভুত কৌশলে রেখে দেওয়া হতো। তারা এমন মশলা ও ঔষধ আবিষ্কার করেছিল যা দিয়ে মৃতদেহকে অবিকৃত অবস্থায় হাজার হাজার বছর রেখে দেওয়া যেত। সেই মশলা ও মলম মৃত ফারাওয়ের দেহে মাখিয়ে দেওয়া হত। তারপর দেহটাকে দামী পাতলা কাপড়ে জড়িয়ে কফিনের মধ্যে রাখা হত। এরকম সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলে 'মমী'। এ ধরনের মমী কলকাতার যাদুঘরে মিশর থেকে এনে রাখা হয়েছে।

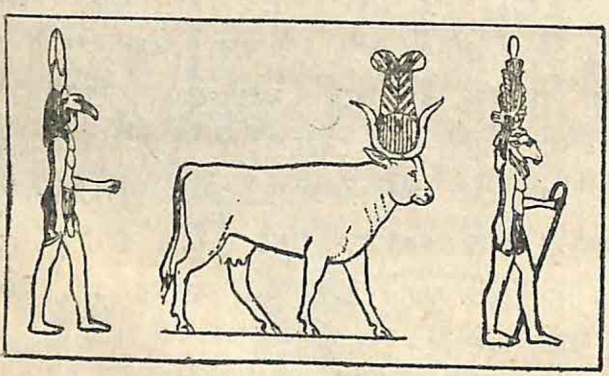
প্রাচীন মিশরীয়রা বড় বড় পাথরের মন্দিরও বানাত দেবতার জন্য। এ মন্দিরগুলোর মধ্যে কারনক বিশেষ নামকরা ছিল। একশ-ছত্রিশটি স্তম্ভের ওপর সুন্দর ছাদ বানিয়ে এটা তারা তৈরী করেছিল, যার ভগ্নাবশেষ আজও সকলকে অবাক করে দেয়। ফারাওদের পাথরের মূর্তিও তারা তৈরী করত।

চতুর্থ রাজবংশের খাফ্রে নামক এক ফারাও একটা আস্ত

পাথরের পাহাড় কেটে বিরাট অদ্ভুত মূর্তি তৈরী করান। এ মূর্তিটার দেহটা সিংহের মত, কিন্তু মাথাটা মানুষের মত। এ মূর্তিটা আজও প্রসিদ্ধ স্ফিংক্‌স নামে পৃথিবীর একটা আশ্চর্য বস্তু হয়ে আছে।

ধর্ম বিশ্বাস ঃ প্রাচীনকালে মিশরীয়দের বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা প্রাকৃতিক বিষয় এবং পশুর পূজো করত। ষাঁড়, ভেড়া, সিংহ, বেড়াল ও কুকুর প্রভৃতি জন্তুর পূজোর কথা জানা যায়। তারা





মিশরের বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি

দেব-দেবীর পূজোও করত। অ্যামন-র ছিল এদের প্রধান দেবতা। আর ফারাওকে তারা মনে করত এই দেবতার প্রতিনিধি। ফারাওকে তারা দেবতা মনে করে পূজো করত। তাদের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিল ওসিরিস, যে ছিল নীলনদের দেবতা। শস্য যাতে ভাল হয় তার জন্য তারা একে পূজো করত।

মিশরীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভাল বা মন্দ কাজের জন্য আত্মা যেমন পুরস্কৃত হয়, তেমনি শাস্তিও পায়। ভাল আত্মা দেবতা ওসিরিসের কাছে ফিরে আসে। আর খারাপ আত্মা নিচুজাতের পশুর আকার ধারণ করে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কষ্ট ও শাস্তি ভোগের পর তারা আবার মানব জন্ম ফিরে পায়। একেই বলা হয় পুনরুজ্জীবন বিধি।

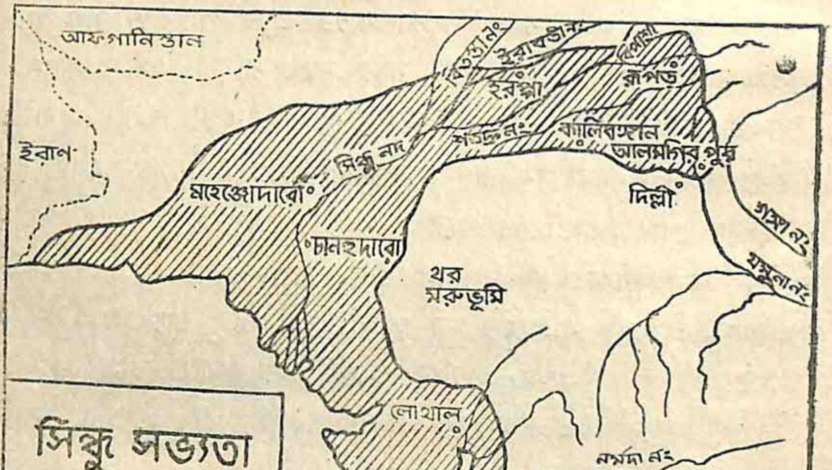
প্রধান জীবিকা: সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা মিশরের লোকেদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় ছিল চাষবাস করা ও পশু পালন। তারা গরু-ভেড়া এবং অন্যান্য পশুও পালন করত। এ সমস্ত পশুরা যাতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস পায় তার জন্য সরকার থেকে সব সময় নজর রাখা হত। জলসেচ ব্যবস্থা ও চাষবাসের সুবিধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বন্যার সময় ছাড়া অন্য সময়ে চাষবাসের জন্য মিশরের লোকেরা নীলনদ থেকে জল সেচ করে জমি চাষ করত। নদীতে যখন জল কম থাকত তখন খাল কেটে শাতুফ নামক এক রকম চমৎকার যন্ত্রের সাহায্যে জল তুলে, সেই খাল বেয়ে জল নিয়ে ক্ষেতে দিত। এখানে বৃষ্টি বিশেষ হয় না। তাই অনেক সময়ই তাদের এভাবে নদী থেকে জল তুলে ক্ষেতের ফসল বাঁচাতে হতো।

এই চাষবাস ও পশুপালন ছাড়া অন্যান্য কাজও তারা করত। এখানে নানা শিল্প গড়ে উঠেছিল। সুদক্ষ শিল্পী ও কারিগর ছিল। তাদের নিয়ে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার এত গর্ব। তারা হাতীর দাঁতের, কাঁচের, দামী-দামী পাথর এবং প্রবাল ও হীরে দিয়ে নানা সৌখিন জিনিস বানাত। এছাড়া সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র তৈরী করত। সুন্দর সুন্দর চিত্র-শিল্প গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে ম্যাজিকের প্রচলন ছিল। তারা সুন্দর সুন্দর বাগান গড়ে তুলতে ভালবাসত। মিশরের তুলো ছিল উন্নত জাতের। তারা তাঁতশিল্পেও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু সভ্যতা

ভারতবর্ষের সভ্যতারও বয়সও অনেক। অনেকে মনে করেন যে, মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক ছিল এই সভ্যতা। আর এই সভ্যতা ছিল অনেক উন্নত ধরনের। এও ছিল নাগরিক সভ্যতা। এর নাম সিন্ধু সভ্যতা। অর্থাৎ সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা।



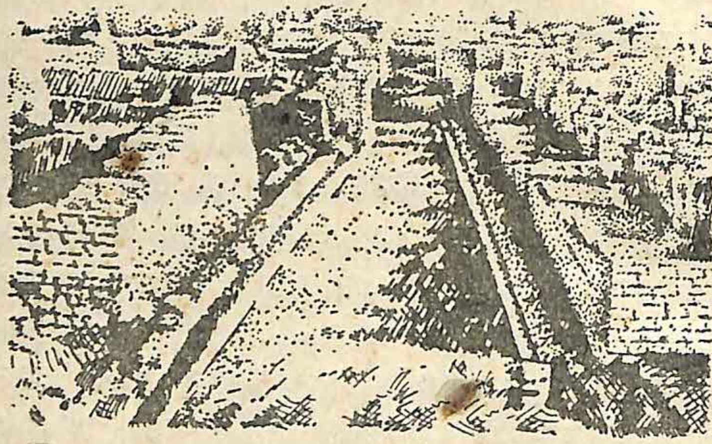
আবিষ্কার ও স্থান ঃ আগে লোকের ধারণা ছিল যে, আর্যজাতির ভারতে আসার ফলে ভারতবর্ষে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু ১৯২২-২৩ সালে সিন্ধুনদের অববাহিকায় মাটি খুঁড়ে এক প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কার করেন ঐতিহাসিকরা। এদের মধ্যে স্যার জন মার্শাল ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। এ আবিষ্কারের ফলে সকলের ধারণা পাল্টে গেল। প্রমাণিত হল যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক সুসভ্য জাতি বাস করত। এ সভ্যতা ছিল প্রস্তর যুগের পরবর্তী তাম্র যুগের।

এই সিন্ধু সভ্যতার যে দুটি স্থানের সন্ধান প্রথমে পাওয়া যায় তার একটি হল সিন্ধুদেশের অন্তর্গত মহেঞ্জোদড়ো, আর একটি হল পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পা। এদুটো স্থান এখন পাকিস্তানে। এছাড়া আছে মহেঞ্জোদড়োর কাছে কটদিজি, খগ্গর নদীর কাছে কালিবঙ্গন, চণ্ডীগড়ের কাছে রূপড়, আমেদাবাদের কাছে লোথাল। প্রায় সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারত জুড়ে ছিল এই সভ্যতা। অনেক মাটি খুঁড়ে এগুলো আবিষ্কার করতে হয়েছে। মহেঞ্জোদড়ো নামের অর্থ মৃতের স্তূপ। অর্থাৎ অনেক মৃত দেহের কঙ্কাল স্তূপাকারে এখানে পাওয়া গেছে মাটির নীচে। এর মানে হয়তো নদীর বন্যার কাদামাটির তলায় এ শহর চাপা পড়ে গিয়েছিল। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে তা দেখে অবাক লাগে। স্নানের ও সাঁতারের জন্য 'গ্রেট বাথ', পাকারাস্তা ও বাড়ির ভাঙা অংশ, পাকা নর্দমা, বিরাট শস্য ভাণ্ডার, কূপ, বস্তী বাড়ির নমুনা ও নানা ধরনের হাতের কাজ করা মাটির পাত্র, দেব-দেবীর মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়োতে নানা প্রকার শীলমোহর পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে যা লেখা আছে তা আজও পড়া যায়নি। তবুও পাওয়া বিভিন্ন জিনিস থেকে যা অনুমান করা যায় তাতেই বিস্মিত হতে হয়।

শহরের পরিকল্পনা ঃ সিন্ধুসভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা অর্থাৎ এখানে সুন্দর সুন্দর সুপরিকল্পিত শহর গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটি শহরের দুটো অংশ ছিল—উঁচু অঞ্চল ও নিচু অঞ্চল। নিচু অঞ্চলের এলাকা উঁচু অঞ্চলের থেকে বেশী ছিল। সেখানে সাধারণ লোকেরা বেশী সংখ্যায় বাস করত। উঁচু অঞ্চল গড়ে তোলা হত মাটি ফেলে উঁচু করে। উঁচু অঞ্চলে ধর্মীয় ও সরকারী বাড়ি, কারখানা, গুদামঘর বা শস্য ভাণ্ডার থাকত। এ ব্যবস্থা করার কারণ ছিল বন্যা বা বাইরের আক্রমণ হলে লোকেরা যাতে উঁচু অংশে আশ্রয় নিতে পারে।

মহেঞ্জোদড়ো শহরের উঁচু অঞ্চলে অনেক বড় বড় বাড়ির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে গভর্নরের বাড়ি, সভাকক্ষ এবং বিরাট

স্নানাগার বা 'গ্রেটবাথ' বিশেষ ভাবে খ্যাত। পোড়া ইঁট ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে এই সব পাকা বাড়ি ও জলাধারটি তৈরী হয়েছিল।



মহেঞ্জোদড়ো শহরের ধ্বংসাবশেষ

এই গ্রেটবাথের মাপ ছিল ১২ মি. × ৭ মি. × ৫ মি.। এর চারি ধারে বাঁধানো রাস্তা ছিল। এর মধ্যে ভাল জল আনার ও স্নানের পর দূষিত জল নিকাশের ব্যবস্থা ছিল।

আর হরপ্পায় দেখা গেছে বিরাট আকারের শস্য ভাণ্ডার। এর মাপ ছিল ৫০ মি. × ৪০ মি.। এখানে শ্মশান, ধাতু গলাবার জন্য চুল্লী এবং মাটির পাত্র অনেক পাওয়া গেছে। বস্তীবাড়ির নমুনাও পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় সেখানে কারখানা বা কারিগরী প্রতিষ্ঠান ছিল। তাই সেখানে শ্রমিকরা বাস করত। নিচু অঞ্চলগুলোও সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বাড়িঃ রাস্তার দুধারে ছিল পাকা বাড়িগুলো। অধিকাংশ বাড়ি ছিল দু-তলা। বাড়িগুলোকে কারুকার্য অপেক্ষা আরামপ্রদ করার দিকে বেশী নজর দেওয়া হত। সরু গলির দিকে বাড়ি-গুলোর জানালা ও দরজা থাকত। ছাদ তৈরী করা হত বাঁশের পাটাতন বা কড়ি-বরগার ওপর কাদা-মাটি দিয়ে। মহেঞ্জোদড়ো

ও হরপ্পায় দেখা গেছে যে, তারা পাকাবাড়িগুলোর দেওয়াল বিশেষ মশলা দিয়ে মসৃণ করত। অনেক বড় বড় মাটির হাড়ি ও উনুন থাকত প্রত্যেকের রান্নাঘরে। প্রত্যেক বাড়িতে এখনকার মত স্নান-ঘর, নর্দমা ও খোলা বাগান থাকত। সেখানে গৃহপালিত পশুরা থাকত। বেশীর ভাগ বাড়িতে পাতকূয়ো ছিল। বড় বড় বাড়ি যেমন ছিল, তেমন ছোট ছোট বাড়িও ছিল। এর অর্থ সেখানে ধনী ও গরীবের বাস ছিল।

রাস্তাঘাট : শহরের রাস্তাঘাট ছিল উন্নত ধরনের। রাস্তার ধারে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। অনেক বড় বড় নর্দমার ওপর পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। রাস্তাগুলো ছিল অত্যন্ত চওড়া। কোন কোন রাস্তা ৯ থেকে ৩৪ ফুট চওড়া ছিল। বড় রাস্তার সাথে গলি-পথের যোগাযোগ ছিল সুন্দরভাবে। রাস্তার বাঁকগুলোতে ইংরেজী এল আকারের ইট ব্যবহার করা হত। এই সমস্ত কিছু আজকালকার উন্নত শহরের ব্যবস্থার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল। বাড়িগুলোতে হাওয়া-বাতাস চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারিক জিনিস : জনসাধারণের খাদ্যের জন্য চাষবাসের বিশেষ প্রচলন ছিল। অনেক যাঁতাকলের সন্ধানও পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় অনেক শস্যভাণ্ডার ছিল। অসময়ের জন্য খাদ্য মজুত রাখার ব্যবস্থা ছিল। তারা গম, যব, বার্লি প্রভৃতি খেত। সম্ভবতঃ ধানের চাষও হত। এছাড়া তারা ফলের মধ্যে খেজুর, ডালিম, কলা ও অন্যান্য ফল ও শাকসব্জী খেত। তারা মাছ, দুধ, গরুর মাংস, ভেড়ার মাংস, হরিণ ও শূকর ছানার মাংস, হাঁস-মুরগীর মাংস ও ডিম খেত। খাদ্যের দিক থেকেও তাদের জীবনযাত্রা বেশ উন্নত ধরনের ছিল।

পোষাক : তখনকার লোকেরা কি ধরনের পোষাক পরত তা আমরা জানতে পারি প্রাপ্ত মূর্তিগুলোর গায়ের পোষাকের ও গহনার ধরন থেকে। মাটির তৈরী অনেক সূতোকাটার টাকু পাওয়া গেছে ঐ অঞ্চলে। এগুলো থেকে বোঝা যায় যে তারা তুলোর ও

পশমের পোষাক বুনতে পারত। তাদের পোষাক দুটো খণ্ডে বিভক্ত ছিল। মেয়েরা গায়ে একরকম পোষাক, আর কোমর থেকে নিচে পর্যন্ত আরেকটা পোযাক পরত। পুরুষেরা নিচে পরত ধুতি জাতীয় কাপড় আর উপরে পরত চাদর জাতীয় পোষাক, সেটাকে বাঁকাধের ওপর থেকে ডান বগলের তলা দিয়ে জড়িয়ে তারা পরত। পুরুষ ও মেয়েদের লম্বা চুল ছিল। পুরুষেরা পছন্দমত দাড়ি ছাটতো। মেয়েরা চুল আঁচড়াতো ও চুলের কাঁটা ব্যবহার করত। আরও মজার ব্যাপার ছিল যে, পুরুষ ও মেয়েরা গহনা ব্যবহার করত। আর মেয়েরা ব্যবহার করত গলায় হার, হাতে আংটি, নাকে ও কানে নানান গহনা। ধনীরা ব্যবহার করত সোনা, রূপো, হাতীর দাঁতের ও নানান ধরনের দামীপাথরের গহনা। আর গরীবরা ব্যবহার করত ঝিনুক, রুদ্রাক্ষ ও নানান রকমের হাড়ের গহনা। মেয়েরা সাজগোজ করার জন্য আয়না ও অন্যান্য সাজবার জিনিস ব্যবহার করত।

আসবাবপত্র ঃ যে সমস্ত আসবাবপত্র ও বাসন-কোসন পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় কতকটা উন্নত ছিল এই সিন্ধুসভ্যতা। রান্নার জন্য ও অন্যান্য কাজে নানান ধরনের কারুকার্যকরা মাটির বাসন তারা ব্যবহার করত। তারা পাথরের তৈরী যাঁতা ব্যবহার করতো। তারা জাজিমও ব্যবহার করত। এছাড়া তারা তামা বা ব্রোঞ্জের ছুরি, কোদাল, করাত, বড়শী প্রভৃতি নানান জিনিস এবং হাতীর দাঁতের স্ূঁচ ব্যবহার করত।

তারা কাঠের তৈরী চেয়ার, চৌকি, তামা বা মাটির প্রদীপ ব্যবহার করত। শিশুদের জন্য নানান ধরনের খেলনা ও পুতুল তারা বানাতো। চাকাওয়ালা খেলনা গাড়ির নমুনাও পাওয়া গেছে। বল, পাশা ও মার্বেল খেলা তাদের খুব প্রিয় ছিল। যাতায়াতের জন্য ষাঁড়ের গাড়ির প্রচলন ছিল। সেগুলো দেখতে অনেকটা ছিল আজকালকার একা গাড়ির মত। জিনিস পত্রের ওজন মাপার ব্যবস্থা ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার যুগের লোকেরা তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরী অনেক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র ব্যবহার করত। এগুলোর মধ্যে কোদাল, করাত

যেমন ছিল, তেমনি তীর-ধনুক, তরবারি, ঢাল, বর্ম ও আরও অনেক কিছু ছিল।

কারিগরী শিল্প: শিল্পের দিক থেকে ও সিন্ধুসভ্যতা বেশ উন্নত ছিল। তাদের শিল্পেও কারিগরী দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা সূতোর কাপড় বুনতো। তারা পশমের পোষাকও বানাতো। ধনী বা দরিদ্ররা এসব পোষাক পরতে খুব ভালবাসত। দক্ষ কারিগর সস্তা বা দামী জিনিস দিয়ে অনেক সৌখিন জিনিস বানাতো। তারা কাপড় রং করতে জানতো। এছাড়া মাটির জিনিসের কাজও ছিল অপূর্ব। ভারতের পরবর্তী-কালের কারিগরী শিল্প এযুগের শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মানুষের ও পশুর মূর্তি অনেক পাওয়া গেছে অনেক শীলমোহরের মধ্যে। ঐ শীলমোহরগুলোতে বাঘ, হাতী, ষাঁড়, একশিংওয়ালা প্রাণী, গণ্ডার প্রভৃতি প্রাণীর মূর্তি দেখা যায়। এইগুলো থেকে বোঝা যায় যে, তাদের শিল্পকর্ম ও কারিগরী দক্ষতা কত অপূর্ব ছিল।

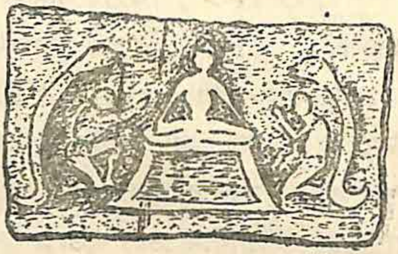
ব্যবসা-বাণিজ্য: মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে সমস্ত শীলমোহর পাওয়া গেছে তার মধ্যে জাহাজের ছবিও পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় যে সেখানকার লোকেরা ভারতের মধ্যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করত না, তারা ভারতের বাইরেও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। তারা পশ্চিমে সাগর পেরিয়ে সুমার এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য সুসভ্য-দেশের সঙ্গে ব্যবসা করত। সম্ভবতঃ মিশর ও ক্রীটের সাথেও তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

পূজো: যে সমস্ত শীলমোহর বা মূর্তি পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় তা থেকে সে-সময়কার লোকদের ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু কোন লিখিত বই নেই, সেজন্য তাদের ধর্ম কি ছিল বা তারা কিভাবে পূজো বা ধর্মানুষ্ঠান করত তা ঠিক জানা যায় না।

তবে সিন্ধু উপত্যকায় যে সমস্ত সুসজ্জিত দেবী মূর্তি পাওয়া

গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে মাতৃদেবীর আরাধনা হত। এধরনের মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন





সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন দেবী মূর্তি

সভ্যদেশগুলোতেও। পৃথিবীকে প্রাচীন লোকেরা যে মা বলে শ্রদ্ধা করত এগুলো তার প্রমাণ। শীলমোহরগুলো থেকে এমনও ধারণা করা হয় যে, দেবীর কাছে মানুষ বা পশু বলি দেওয়া হত তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য।

আর পুরুষ দেবতাদের যে বিশেষ দেবমূর্তি পাওয়া গেছে তাকে 'শিব' বলে মনে করা হয়। তিনি যোগাসনে বসে আছেন। তাঁর পা দুটো যোগীর মত ভাঁজ করা। তাঁর মাথায় শিংওয়ালা মুকুট। তার গলায় অলঙ্কার। তার তিনটা মুখ। তাকে ঘিরে রয়েছে নানান ধরনের পশু অর্থাৎ বাঘ, মোষ ও গণ্ডার। আর তার বেদীর নীচে রয়েছে হরিণ। এ দেবতার মূর্তিকে অনেকে বলেছেন 'পশুপতি' বা পশুদের প্রভু ও অনেকে বলেছেন মহাযোগী। আবার তিনটে মুখ আছে বলে একে অনেকে বলেছেন 'শিব'।

পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, এ দেবতার কথা আর্যরা জানত না। ভারতে আর্যরা যখন আসে তখন এখানকার লোকদের কাছ থেকে জেনে তারা এর পূজো শুরু করে।



পশুপতির মূর্তি

এযুগের লোকেরা যে লিঙ্গ এবং যোনির পূজো করত তার নিদর্শন পাওয়া গেছে শাঁকের মত দেখতে অনেক পাথরের গায়ে। এ থেকে সেযুগের 'শিব' পূজো সম্বন্ধে অনেকে জোর দিয়ে বলেছেন।

এছাড়া সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা পশু ও বৃক্ষের পূজো করত। 'পিপল' গাছ ছিল তাদের কাছে খুবই পবিত্র গাছ। অনেকে জল বা আগুনের পূজোর কথাও বলেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। কিছু কিছু শীলমোহরে স্বস্তিকার ও চাকার চিহ্ন দেখা যায়। তা থেকে মনে হয় সূর্যদেবের পূজো হয়ত হতো। নাগ বা মনসা পূজো হতো বলে মনে হয়। কারণ নাগের ছবি শীল-মোহরে আছে।

সিন্ধু সভ্যতায় লোকেদের মৃত্যুর পর কবর দেওয়া হত। আর কবরে মৃতের পছন্দমত তার ব্যবহৃত জিনিস সঙ্গে দেওয়া হতো। আবার কখনও কখনও পোড়ানো হতো মৃতদেহ। আবার কখনও মৃতদেহ পশু-পাখী দিয়ে খাওয়ান হতো; এগুলো ছিল এক ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান।

প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ: প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার সিন্ধু সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে দেখা যায় যে, এ সভ্যতা শুধু সিন্ধুনদের উপত্যকায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের অনেক স্থানে এ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই 'সে যুগে এত উন্নত সভ্যসমাজে শ্রেণী-বিভাগের

প্রশ্নটাও গুরুত্বহীন নয়। এ নাগরিক সভ্যতার যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে সমাজে ধনী ও গরীব ছিল। শহরের বড় বড় বাড়িগুলো ছিল ধনীদের। আর ছোট বাড়িগুলো ছিল গরীবদের। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প গড়ে তুলেছিল ধনীরা। গরীবরা চাষ-বাস করত। তারা নানান ধরনের হাতীর কাজ করত। ধনীরা পরতো সোনার, রূপোর ও হাতীর দাঁতের গহনা। আর গরীবরা পরতো রুদ্রাক্ষের মালা, হাড়ের গহনা প্রভৃতি। তবে দাড়িওয়ালা যে মূর্তি পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়োতে, তা থেকে অনেকে মনে করেন পুরোহিত শ্রেণীর লোক ছিল সমাজে, যারা পূজো করত। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজে শ্রেণীবিভাগ কি ধরনের ছিল তা খুব সুস্পষ্ট নহে। এ অনেকটা অনুমান মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীন

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকা: ভারতের উত্তর দিকে বিশাল চীনদেশ। এখানেও প্রায় তিনহাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আর চীনের এই প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল হুয়াং বা হোয়াং। এই শব্দের অর্থ পীত বা হলুদ। এই নদীর ঘোলাজল প্রচুর কাদা বা পলি প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বলে এর জল হলুদ দেখায়। এর উভয়তীরে মাটি জমে জমে বাঁধ গড়ে উঠেছিল। আবার মানুষও বাঁধ তৈরী করেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে সে বাঁধ ভেঙ্গে প্রবলবেগে জল আশ-পাশের অঞ্চল প্লাবিত করে দিত। ফলে ঘর-বাড়ি ভেসে যেত। কৃষিজমি নষ্ট হয়ে যেত। এমনি করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করত হোয়াং নদীর বন্যা। তাই এই নদীকে বলা হত 'দুঃখের নদী' বা 'চীনের দুঃখ'। অপর নদী ইয়াংসিকিয়াং-এর উপত্যকায়ও বন্যা হত। কিন্তু সেটা অত মারাত্মক ছিলনা। ইয়াংসিকিয়াং নৌকা চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। এই নদীর শাখা-উপশাখাও

অনেক। পলিমাটি জমে জমে এই অঞ্চল খুব উর্বর ছিল। এই ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকার ওপরের অংশে অত্যন্ত উর্বর **'লোহিত আধার ভুমি'**। সেখান থেকে নদী অনেক অঞ্চল দিয়ে বয়ে গিয়ে সাংহাইর কাছে সাগরে গিয়ে মিশেছে। হোয়াংহো নদীর উপত্যকাও খুব উর্বর ছিল। এর ফলে এই নদী দুটোর উপত্যকায় বহু লোক এসে বাস করতে থাকে এবং এরাই আস্তে আস্তে সেখানে গড়ে তোলে প্রাচীন চীন-সভ্যতা। এই চীন সভ্যতাও সুমেরীয়, মিশরীয় বা সিন্ধু সভ্যতার মত উন্নত ছিল।

প্রাচীন চীন: প্রাচীন চীন সম্বন্ধে যা-কিছু জানা যায় তার বেশীরভাগই রয়েছে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে। এরা ছিল তাম্র-যুগের সমসাময়িক। ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় যারা বাস করত, তারা খুব সাহসী, কর্মঠ ও সুসভ্য ছিল। তারা আশপাশের অঞ্চল জয় করেছিল। এরা ছিল মোঙ্গলীয় জাতি। এরা ঐ সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে আস্তে আস্তে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। প্রাচীন চীনের লোকেরা গুটিপোকা বা রেশমীপোকা থেকে রেশমী সূতো বার করে রেশমী কাপড় বুনতে জানত। তারা ভালভাবেই কাপড় ও বিভিন্ন জিনিস রঙ করতে জানত। তারা তামা বা সোনা দিয়ে বাসন-পত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরী করত। এখানকার লোকেরা মাছ ধরার জাল বুনতে পারত। এরা চুম্বকের আবিষ্কার করেছিল। এছাড়া নানান যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরী করেছিল। এরা পশুপালন করত। এই গৃহপালিত পশুগুলোর মধ্যে ছিল ভেড়া, শূকর, মুরগী, ঘোড়া প্রভৃতি। এরা কৃষিকাজ ও নানান শিল্পকাজে খুব দক্ষ ছিল। এখানকার লোকেরা লেখাপড়া জানত এবং লেখার জন্য এরা অক্ষর ব্যবহার করত। এরা সর্বশক্তিমান এক দেবতার পূজো করত, যাঁর নাম ছিল 'শাঙ্গরী'। এখানকার লোকেরা পরজন্মের কথা বিশ্বাস করত না। এখানকার লোকেরা নিজেরাই রাজা নির্বাচন করত। এখানে ১১০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন 'উ' এবং 'শাং' রাজারা শাসন করেছিলেন।

বন্যা ও পৌরাণিক কাহিনীঃ চীনের পৌরাণিক কাহিনীতে আছে যে, পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন পোন-কু। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহের এক একটি অংশ পৃথিবীর এক একটা জিনিসে পরিণত হয়েছিল। এমনি করেই নাকি তাঁর একটি অঙ্গ থেকে হয়েছিল নদীর জন্ম। আর প্লাবন বা বন্যা ছিল চীনাদের কাছে এক বিরাট অভিশাপ। বিশেষ করে হোয়াংহো বা পীত নদীর বন্যা ছিল মারাত্মক। এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাচীনকালে চীনের রাজারা অনেক চেষ্টা করেছেন। এই বন্যা সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক কাহিনী আছে। চতুর্থ শাসক ইয়াও ছিলেন অত্যন্ত উদার। তিনি তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী ঠিক করতে চেয়েছিলেন এমন একজনকে যিনি বন্যার ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে পারবেন। তিনি বলতেন—"...চেয়ে দেখ, প্লাবনের জল আকাশকে স্পর্শ করতে উদ্যত।" এই প্লাবন বন্ধ করার জন্য শেষে কুন বলে একজনকে ভার দেওয়া হল। কিন্তু নয় বছর ধরে চেষ্টা করেও কুন বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেন না।

এই কুনের ছেলে 'ইউ' ছিলেন একজন কৃতি ইঞ্জিনিয়ার। তিনি শেষে নয় বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে জল নিষ্কাশন ও বাঁধ তৈরী করে পীত নদীকে তার প্রবাহ মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন। চীনা প্রবাদ আছে যে, ইউ না থাকলে অর্থাৎ তিনি যদি বন্যাকে রোধ করতে না পারতেন তবে চীনারা সব মৎস্যকুলে পরিণত হতো। 'ইউ'র এই ক্ষমতার জন্যই তাঁকে রাজা করা হয়েছিল এবং তিনিই স্থাপন করেছিলেন 'সিয়া' রাজবংশের।

এছাড়া আরও জানা যায় যে, বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চীনারা নদী দেবতার পূজো করত। নদী-দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হো-পো, অর্থাৎ পীতনদীর অধীশ্বর। এই নদীর উপত্যকায় চীনা সভ্যতার জন্ম। এখানে যাদুকর 'উ' সম্প্রদায়ের এক বিখ্যাত মন্দিরে দেবতাকে খুশী করার জন্য নরবলি দেওয়া হত। মন্দিরের পূজারিণী দেবতার স্ত্রীরূপে এক সুন্দরী মেয়েকে নির্বাচিত করতেন। তারপর তাকে নানান সাজে সাজিয়ে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হতো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নদীমাতৃক সভ্যতা গুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন

আমরা দেখলাম কেমন করে নদীর আশেপাশে উর্বর কৃষি জমিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মানবসভ্যতা গড়ে উঠল। আর ধাতুর আবিষ্কার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও নাগরিক সভ্যতা মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে আনল আরও পরিবর্তন। মানুষ গড়ে তুলল সমাজ ও রাষ্ট্র। সমাজে গড়ে উঠল বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণী বৈষম্য। কিন্তু এরই সাথে সাথে মানব সভ্যতা এগিয়ে চলল। এইভাবেই গড়ে উঠল ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর ধারে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, মিশরের নীলনদের উপত্যকায় মিশরের সভ্যতা, সিন্ধুনদের অববাহিকায় সিন্ধু-সভ্যতা এবং হোয়াংহো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর উপত্যকায় প্রাচীন চীনের সভ্যতা। এই নদীমাতৃক সভ্যতা গুলোতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অনেক মিল ছিল। আর এর মিলগুলো বোঝা যায় তাদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন কিরকম ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করলে।

সমাজ জীবন ঃ মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতায় দেখা গেছে বেশীর ভাগ লোক ছিল কৃষক। সমাজে পুরোহিতদের বিশেষ প্রভাব ছিল। মন্দিরের পুরোহিত কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করে দিতেন। তাদের ধারণা ছিল যে, সমস্ত জমিই ঈশ্বরের। তাদের জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল। তারা দেবতাদের পূজো করত সকলের মঙ্গলের জন্য। তাদের মৃতদেহকে বাড়ীতে কবর দেওয়া হত যাতে সে মনে না করে যে, সে অবহেলিত। মিশরীয়দের মত তারাও মৃতদেহগুলোর কবরে নানান জিনিস দিয়ে দিত।

ব্যাবিলনীয়দের সমাজেও তিনটি শ্রেণী ছিল। সর্বোচ্চ শ্রেণী ছিল আমেনু বা অভিজাত। মাস্কিনুরা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা ছিল কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ কারিগর। আর নিম্ন শ্রেণী ছিল ক্রীতদাস।

স্ত্রীলোকদের খুব সম্মান করা হত এবং তারা ছিল স্বাধীন। সুমেরীয়দের মত অভিজাতরা পাকা বাড়িতে থাকত। এদের মৃতদেহকেও কবর দেওয়া হত বাড়িতে।

আসিরিয়দের সমাজেও তিনটি শ্রেণী ছিল। বেশীর ভাগ বৃত্তি ছিল বংশগত। এদের সমাজেও ক্রীতদাস ছিল।

মিশরীয়দের সমাজেও তিনটি শ্রেণী ছিল। ফারাও, অভিজাত ও পুরোহিতরা ছিল উচ্চশ্রেণীভুক্ত। এরপর ছিল লেখক, দক্ষ কারিগর ও কৃষক। এখানেও ক্রীতদাস ছিল। ধনীরা বাস করত বড় বড় পাকা বাড়িতে। আর কৃষকরা বাস করত সাধারণ বাড়িতে। নদীর ধারে ধারে কৃষকরা মাটির ঘরে বাস করত। পরিবার ছিল সুপরিকল্পিত। স্ত্রীলোকেরা সংসার চালাত। আইনের চোখে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার ছিল।

সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, তাতে বোঝা যায় যে, ধনী ও দরিদ্রের বাস ছিল সে সমাজেও। পুরোহিত শ্রেণীরও পরিচয় পাওয়া যায়। ধনীরা বড় বাড়িতে আর গরীবরা ছোট বাড়িতে বাস করত। এখানকার সামাজিক জীবনও উন্নত ছিল।

আর প্রাচীন চীনের সামাজিক জীবনের মূল কেন্দ্র ছিল পরিবার। পরিবারের প্রধান যিনি ছিলেন তাঁর গুরুত্ব ছিল অনেক। তাঁকে পরিবারের সকলে খুব মেনে চলত। পরিবারের সকলের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল। পরিবারের প্রধান যিনি তার সম্মানও ছিল পরিবারের সকলের ওপর। এদের সমাজেও বেশীর ভাগ লোক ছিল কৃষক।

অর্থ নৈতিক জীবন ঃ এই নদীমাতৃক সভ্যতার লোকেদের অর্থ নৈতিক জীবন প্রায় একই রকমের। কৃষিই ছিল এদের বেশীরভাগ লোকের প্রধান জীবিকা। তারা পশু পালন করত। এছাড়া ছিল প্রচুর বনসম্পদ। আর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ধাতুর আবিষ্কারের ফলে কারিগরী শিল্প গড়ে উঠেছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য আরো প্রসারিত হয়েছিল। নৌকাযোগে জলপথে এরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত দূর দূরান্তে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এইসব সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন

জায়গায়। মিশরীয় সভ্যতা এইভাবে ক্রীট, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থারও আরো উন্নতি হয়েছিল। তাদের জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা দেখা গিয়েছিল। এর ফলে মানব সভ্যতারও উন্নতি হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন সভ্যতাগুলো কি কি?

২। নীচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দাও :—

(ক) মেসোপটেমিয়া কোথায় অবস্থিত?

(খ) মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা কতদিনের পুরনো? এখানকার মাটি কি রকম ছিল? এখানে কি কি নদী আছে? এখানে কি বন্যা হত? বন্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিছু করা হত কি? এখানকার লোকেরা কি কি কাজ করত?

৩। সুমেরীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কি জান?

৪। নীচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দাও :—

(ক) মিশর কোথায়? এখানকার জমি কি ধরনের ছিল?

(খ) ফারাও কে ছিলেন?

(গ) মিশরের পুরোহিতদের সম্বন্ধে কি জান?

(ঘ) মিশরের লোকেরা লেখার অক্ষর আবিষ্কার করেছিল কি? সে অক্ষরের নাম কি?

(ঙ) মিশরের লোকেরা প্রাচীনকালে কি থেকে কাগজ তৈরী করত?

৫। হ্যাঁ বা না বল :—

(ক) মিশরীয়দের মধ্যে সাহিত্য চর্চা হত……।

(খ) সেই সময় কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না……।

(গ) মিশরীয়দের কোন সামরিক বাহিনী ছিল না……।

৬। প্রাচীন মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য কি রকম ছিল?

৭। পিরামিড সম্বন্ধে যা জান বল। 'মমী' কাকে বলে? 'মমী' কিভাবে তৈরী করা হত?

৮। মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কি জান? তাদের প্রধান দেবতা কে? নীলনদের দেবতার নাম কি?

৯। মিশরীয়দের প্রধান জীবিকা কি ছিল?

১০। নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দাও :—

(ক) সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন কোন কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে? 'সিন্ধুসভ্যতা' নাম হল কেন?

(খ) সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা কি রকম ছিল?

(গ) সেখানকার লোকদের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিস সম্বন্ধে কি জান?

(ঘ) এই সভ্যতার কারিগরী বিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ঙ) এই স্থানের সমাজ ব্যবস্থা ও পূজো-পার্বণ সম্বন্ধে কি জান?

১১। চীনের হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১২। প্রাচীন চীন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৩। চীনের পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে কি জান?

১৪। নদীমাতৃক সভ্যতাগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৫। নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া আছে, তার মধ্যে সঠিক উত্তরে [√] চিহ্ন দেবে :—

(ক) প্রাচীন সভ্যতাগুলো কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উত্তর : পাহাড়ের গুহায়/নদীর ধারে ধারে।

(খ) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় কোন অঞ্চল ছিল?

উত্তর : চীন/মেসোপটেমিয়া।

(গ) সিন্ধুসভ্যতা কোন দেশের?

উত্তর : মধ্য এশিয়ার/প্রাচীন ভারতের।

(ঘ) সিন্ধুসভ্যতা কি ধরনের সভ্যতা ছিল?

উত্তর : নাগরিকসভ্যতা/গ্রামীনসভ্যতা।

(ঙ) 'চীনের দুঃখ' কোন নদীকে বলা হয়?

উত্তর : ইয়াংসিকিয়াং/হোয়াংহো

(চ) প্রাচীন চীনে সর্বশক্তিমান দেবতার নাম কি?

উত্তর : 'পশুপতি'/'শাঙ্গরী'

(ছ কোনটিকে পিরামিডের দেশ বলা হয়?

উত্তর : ভারত/মিশর

প্রথম পরিচ্ছেদ

লোহার আবিষ্কার, তার ব্যবহার ও এর ফল : এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিভাবে মানব সভ্যতা গড়ে উঠল। তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার এই সভ্যতাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর লোহার আবিষ্কার ও তার ব্যবহার মানুষের সভ্যতাকে আরেক স্তরে এগিয়ে নিয়ে গেল। মানুষের জীবনযাত্রা আরো পাল্টাতে আরম্ভ করল। লোহা গলিয়ে আরো শক্ত বা শক্তিশালী যন্ত্রপাতি তৈরী হতে লাগল যা আরো বেশী করে কাজে লাগল মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে। রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব দেখা গেল রাজতন্ত্রের সৃষ্টির মধ্যে। তামা বা ব্রোঞ্জের যন্ত্র বা হাতিয়ার দিয়ে যা করা সম্ভব ছিল না, এখন তা' করা সহজ হল। নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠল। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার হল। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসতে লাগল। আর মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও উন্নতি হল সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে। তাই ইতিহাসে এই লৌহযুগের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই লৌহযুগ থেকেই ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয়েছে। কারণ এই সময় থেকেই ইতিহাস লেখার মত অনেক লিখিত উপাদান পাওয়া যায়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক : লোহা আবিষ্কার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন আনল। বড় বড় স্তম্ভ বা স্তূপ তৈরী হয়েছিল। এগুলো যে পাথরের তৈরী তাতে খনিজ লোহা প্রচুর পরিমানে ছিল। ভারতের অনেক জায়গায় এই ধরনের বহু স্তূপ, স্তম্ভ ও মন্দির আছে। পালিশ করা যন্ত্র, চাকাসমেত গাড়ি, বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই সমস্ত জিনিসগুলোর মধ্যে তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা ও লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে তাম্রযুগ থেকে লৌহযুগে আসতে মানুষ ক্রমে ক্রমে এগিয়েছে। এতে

আরও বোঝা যায় যে, তারা নূতন ধাতুর ব্যবহার শিখলেও পুরনো ধাতুর ব্যবহার ছেড়ে দেয়নি। মানুষের সভ্যতা এভাবেই এগিয়েছে।

লোহা গলিয়ে কামার শালে তৈরী হল লাঙল, কোদাল, কাস্তে, হাতুড়ি, দাঁ, করাত, বাটালি ইত্যাদি নানান যন্ত্রপাতি ও পরে লোহা ঢালাই করে নানান জিনিস তৈরী হতে লাগল। এর ফলে চাষেরও উন্নতি হল প্রচুর। কারিগরী শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির আরো উন্নতি হল।

মানুষ সমাজে আরো সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠী বা জাতি গঠন করল। এবং শক্তিশালী ধারাল অস্ত্র তৈরী হওয়ায় যুদ্ধবিদ্যার পরিবর্তন হল। মানুষের সমাজে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দেখা দিল দ্বন্দ্ব। এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে পরাজিত করে প্রাধান্য স্থাপন করবার চেষ্টা করল। এর ফলে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য দেখা দিতে লাগল আরো স্পষ্ট করে।

রাজতন্ত্রের উত্থান ঃ সমাজের পরিবর্তন আরো লক্ষ্য করা গেছে রাজতন্ত্রের সৃষ্টির ফলে। গোষ্ঠীর নেতা কিভাবে রাজায় পরিণত হল তা ঠিক ভাবে জানা যায় না। অনেকে মনে করত যে, ভগবানই রাজা সৃষ্টি করেছেন। তাই রাজাকে দেবতার মত ভক্তি করা হত। রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, ন্যায় ও নীতি। কিন্তু ভারতে ও অন্যান্য অনেক জায়গায় দেখা যায় গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের মধ্যে যিনি যুদ্ধবিদ্যায়, বুদ্ধি ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাকেই তারা নেতা হিসাবে নির্বাচিত করত। তার নেতৃত্বে সমাজে সকলের ভালর জন্য আইন তৈরী করা হত। আবার অপর গোষ্ঠীকে পরাজিত করে রাজ্য বিস্তারও করা হতে লাগল। যুদ্ধ পরিচালনা করতেন এই দলনেতা। তাকে তারা মেনে চলতে লাগল সর্বক্ষেত্রে। ক্রমশ এরা এই নেতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। সম্ভবত এভাবেই রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। পরে রাজতন্ত্র বংশগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিকে রাজা যাতে অত্যাচারী না হতে পারে তার জন্য 'সভা' বা সমিতি' থাকত। ভারতে আর্যযুগে এই জিনিস দেখা যায়। অন্য জায়গায়ও এই ধরনের

উদাহরণ আছে। পরে রাজা, একরাট বা সম্রাট উপাধির কথাও আমরা জানি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যাবিলন

মেসোপটেমিয়ায় ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উপত্যকায় যে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সে সভ্যতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল—সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও অসিরিয় সভ্যতা। প্রায় ২৯০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সেমিটিক জাতির লোকেরা সুমারে প্রবেশ করে। তারা সুমার জয় করে প্রাচীন শহর ব্যাবিলনে রাজধানী স্থাপন করে। সেইজন্য এ সভ্যতাকে 'ব্যাবিলনীয় সভ্যতা' বলা হয়। এদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন 'হামুরাবি', যিনি সমস্ত মেসোপটেমিয়া জয় করেছিলেন এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। সুমেরীয়দের কিছুই তিনি নষ্ট করেন নি। তার সময় কৃষির উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি হয়।

কৃষি ও বাণিজ্য ঃ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর অববাহিকায় উর্বর জমিতে চাষের উন্নতি হয়েছিল। কৃষিখামার গড়ে উঠেছিল। কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা। নদী থেকে জলসেচ করে তারা চাষ করত। তারা খাল খনন করে জল সেচের ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করেছিল। কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করা হত। জমির ওপর সকলের অধিকারকে স্বীকার করা হত। জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা স্থলপথ ও জলপথ ব্যবহার করত। তারা উন্নত ধরনের ফসল ফলাত। এ ফসল গুলোর মধ্যে বার্লি, নানান ধরনের শাক-সব্জি, গম ও নানান ধরনের ফল ছিল। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল তারা অন্যত্র বিক্রি করত। অন্যান্য দেশের সাথে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

বাণিজ্য ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাবিলন খুব উন্নতিলাভ করেছিল।

ব্যাবিলন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিরাট কেন্দ্র। শুধু কৃষিজাত পণ্যই নয়, অন্যান্য জিনিস তারা বিভিন্ন দেশে চালান দিত। তারা কারিগরী শিল্পেও উন্নতি লাভ করেছিল। তারা পশমের জিনিসও বানাতে পারত। তারা সুন্দর সুন্দর শাল (পশমী চাদর), গালিচা (কার্পেট) তৈরী করত। তারা দামী দামী রত্ন, সোনা, রূপা ও হাড় দিয়ে শৌখীন জিনিস বানাতো। অন্য দেশে এদের খুব কদর ছিল। ব্যাবিলনের দক্ষ কারিগরদের তৈরী ঐ সমস্ত সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো বিক্রীর জন্য সেখানে দোকান করা হয়েছিল। আরবদেশ, মিশর, লেবানন এবং ভারত থেকে বহু ব্যবসায়ী ব্যাবিলনে যেত এবং সেখান থেকে তারা ঐ সমস্ত জিনিস কিনে আনত এবং তারাও নানান জিনিস ব্যাবিলনে বিক্রী করত। এভাবে ব্যাবিলন শহরে দেশী ও বিদেশী বণিকদের সমাগম হত। ব্যাবিলন শহরও খুব উন্নতিলাভ করেছিল। সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থারও খুব উন্নতি হয়েছিল।

মন্দির ও পুরোহিত ঃ ব্যাবিলনবাসীরা উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। কিন্তু এই প্রাচীন সভ্যতায় ধর্মের একটা বিরাট প্রভাব ছিল। প্রাচীন লোকেরা বিশ্বাস করত সর্বশক্তিমান কোন শক্তিকে। তাই দেব-দেবীর পূজো, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে তারা গুরুত্ব দিয়েছিল। ব্যাবিলনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সুমেরীয় যুগ থেকেই এখানে মন্দির গড়ে উঠেছিল। 'জিগুরাতের' কথা আমরা আগেই বলেছি। আর এ ধর্ম ব্যাপারে পুরোহিতদের যেমন বিশেষ ভূমিকা ছিল, তেমনি রাজ্যশাসন এবং সমাজেও এদের গুরুত্ব ছিল।

ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা হামুরাবি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও যুক্তি-সঙ্গত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুমেরীয় ব্যবস্থাকে বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ব্যাবিলনে অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরগুলোর আয়ের ব্যবস্থাও

করা হয়েছিল। কৃষকদের ফসলের একটা অংশ মন্দিরকে দিতে হত। অন্যান্য কারিগর ও ব্যবসায়ীরা দান করত মন্দিরে। ফলে মন্দিরগুলো সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল। পুরোহিতদের মনে করা হতো ভগবানের প্রতিনিধি। তাই তাদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। রাজারাও তাদের সম্মান করতেন। ব্যাবিলনে চ্যাল-ডিয়ান রাজা নেবুচাডনেজার ব্যাবিলন নগরীকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় সুসজ্জিত করেছিলেন। তিনি রাস্তাঘাট যেমন সুন্দর করে গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি সেখানে তিনি সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরী করেছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ ব্যাবিলনে সেই সময় শিক্ষার প্রসার হয়েছিল। অবশ্য শিক্ষার প্রচলন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পুরোহিতরাও শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিল। এ সময় গণিত বিদ্যার উন্নতি দেখা গিয়েছিল। সময় ও ওজনের পরিমাপ তারা শিখেছিল। ব্যাবিলনের লোকেরা জল-ঘড়ির আবিষ্কার করেছিল।

এ ছাড়া ব্যাবিলনের আসিরিয় রাজা **আসুরবানিপাল** মাটির চাদরের ওপর লেখার পদ্ধতিকে আরও সুন্দর করে তুলেছিলেন। তিনি একটা গ্রন্থাগার বানিয়েছিলেন, যেখানে বইয়ের আকারে দু'হাজারের বেশী মাটির চাদরে লিখিত বিষয় ছিল। এদের অনেকগুলো বর্তমানে লণ্ডনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে' আছে। তার সময়ে স্থাপত্য শিল্প ও ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। পাথর থেকে একটি সুন্দর মূর্তি গড়া হয়েছিল যার মাথার অংশ মানুষের মত, দেহটা ষাঁড়ের। তার গায়ে আবার পাখা আছে। চ্যালডিয়ান রাজা নেবুচাডনেজার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটিয়ে ছিলেন। তারই সময় তৈরী হয়েছিল ব্যাবিলনে পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য 'ঝুলন্তবাগান'। আরেকটি বিশেষ ঘটনা হচ্ছে নেবুচাডনেজার ইহুদীদের শহর জেরুজালেম ধ্বংস করে বহু ইহুদীকে বন্দী করে ব্যাবিলনে এনেছিলেন। সেই ইহুদীদের মধ্যে 'এজেকিয়েথ', 'আমেস', 'ইসায়া' প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মনিষ্ঠ দার্শনিকরা ছিলেন।

তাঁরা বন্দী অবস্থায় থাকাকালে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা 'হিব্রু-বাইবেল' রচনা করেন। এই ধর্মপুস্তক পৃথিবীতে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। এর মধ্যে অনেক আইন, কাহিনী, স্তোত্র, কাব্য, উপন্যাস, রাজনৈতিক তথ্য প্রভৃতি অনেক কিছু আছে।

হামুরাবির আইন ও সামাজিক অবস্থা: ব্যাবিলনের রাজাদের মধ্যে হামুরাবি ছিলেন প্রথম, যিনি জনসাধারণের জন্য আইন রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন সুমেরীয় রাষ্ট্র থেকে আইন সংগ্রহ করে তিনি আইন রচনা করেন। আর আইনের ধারাগুলোকে একটা উঁচু পাথরের খণ্ডতে খোদাই করে সেটাকে ব্যাবিলনে স্থাপন করেন। এতে ছবি আঁকাও আছে। তাতে দেখান হচ্ছে হামুরাবি সূর্যদেবতার কাছ থেকে আইন গ্রহণ করছেন। তবে এ নিয়মাবলী থেকে সে সময়কার সমাজের একটা সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।

আইনের ধারাগুলো হচ্ছে: (১) যদি কেউ অপরকে আহত করে, তবে তাকে সমানভাবে আহত করা হবে। (২) শাস্তি দোষীর সামাজিক মর্য্যাদা অনুসারে হবে অর্থাৎ কোন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি অপরাধ করলে তাকে আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। (৩) ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিচারই প্রধান। (৪) প্রত্যেক ব্যক্তি তার শ্রেণী অনুসারে জীবিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু ক্রীতদাস কাজ করলে মজুরি পাবে। (৫) এ আইনের দ্বারা স্ত্রীলোকদের অধিকার ও সম্মানকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। (৬) প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃষি-খামারে কাজ করতে এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সামরিক বাহিনীতে কাজ করতে বলা হয়েছিল। (৭) আরো বলা হয়েছিল প্রত্যেকটি চুক্তি দলিল বা যে কোন প্রমাণ-পত্রে দু-জন সাক্ষীর সই থাকতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজন, হামুরাবি আইন রচনার দ্বারা তা করেছিলেন। স্ত্রীলোকের অধিকার ও সম্মান যেমন রক্ষা করা হয়েছিল, তেমনি দরিদ্র ক্রীতদাস ও জনসাধারণের রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল, যাতে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাদের ওপর অত্যাচার ও শোষণ না করতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশর ও তার সাম্রাজ্য

মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফারাও ছিলেন তৃতীয় 'থোথমেস'। তাঁকে বলা হয় 'মিশরের নেপোলিয়ন'। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর সম্রাট। যুদ্ধ বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সময়ে মিশর বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

উপনিবেশঃ মিশর সাম্রাজ্যে বহু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। তিনি বারবার পশ্চিম এশিয়ার রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আফ্রিকা অতিক্রম করে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও এশিয়া মাইনরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। নৌযুদ্ধেও তৃতীয় থোথমেস বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ঈজিয়ান সাগরের সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপের রাজারা তাঁকে কর প্রদান করতেন। মেসোপটেমিয়ার রাজারা তাঁর বন্ধুত্ব লাভের জন্য তাঁকে দামী দামী উপহার পাঠাতেন। এভাবে মিশরীয় সভ্যতার অনেক কিছু ঈজিয়ান সাগরের নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এরপর আরও কয়েকজন ফারাও রাজত্ব করার পর **আখ-এন-আটন** রাজত্ব করেন। তিনি ব্যাবিলন, হিটাইট ও অন্যান্য দেশের রাজাদের যে সমস্ত চিঠি লিখতেন তা থেকে তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়। কিন্তু তাঁর সময় সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। এই বংশের আর একজন শক্তিশালী ফারাও ছিলেন **প্রথম সেটি**। তিনি সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে দুর্ধর্ষ অ্যামেরাইট ও হিটাইটদের বহুবার যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে মিশরীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়।

পুরোহিতদের ক্ষমতাঃ এই মিশরীয় সাম্রাজ্যে পুরোহিতদের অনেক ক্ষমতা ছিল। ফারাওগণ তাঁদেরকে সম্মান ও খাতির করতেন। অভিজাতদের চেয়েও পুরোহিতদের ক্ষমতা ও সম্মান ছিল বেশী। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ছিল। রাজ্যের শাসনকাজে তাঁরা ফারাওকে পরামর্শ দিতেন। আবার যুদ্ধের পরিকল্পনা ও অনেক সময় যুদ্ধ পরিচালনা করতেও তাঁরা ফারাওকে সাহায্য করতেন। এছাড়া তাঁরা রাজার সমস্ত কাজের হিসেব লিখে রাখতেন এবং জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের বিষয়ও লিখে রাখতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইরাণ

পারস্যের উত্থান ঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থান, তার পশ্চিমে ইরাণ। এর আরেক নাম 'পারস্য'। এই ইরাণ বা পারস্যের সভ্যতাও অনেকদিনের। এর অধিবাসীরা ছিল আর্য। ইরাণ হচ্ছে বিখ্যাত কবি **ওমর খৈয়াম** এবং ধর্মগুরু ও দার্শনিক **জরথুষ্ট্রের** দেশ। এখানকার লোকেরা সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করত। তারা ছোট ছোট গ্রামে বাস করত। চাষ-আবাদ এবং ভেড়া চড়ানো ছিল তাদের জীবিকা। এদের মধ্যে কোন সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিলনা। এখানে অনেক ছোট ছোট উপজাতি ছিল। তবে পারস্যের আর্যরা ও ভারতের আর্যরা মধ্য এশিয়ার কোন অঞ্চলের একই সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তাই ভারতের আর্যদের 'বেদ' ও ইরাণের 'আবেস্তা'র মধ্যে কিছু কিছু মিলের আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য ইরাণের সভ্যতা ও ভারতের আর্য সভ্যতা আলাদাভাবেই গড়ে ওঠে। তথাপি ভারতের আর্যদের যেমন ধর্ম বিষয়ে উদারতা ছিল, তেমনি ইরাণীয়দের 'জোরস্তার' ধর্মও উদার ছিল।

এই পারস্য বা ইরাণে আস্তে আস্তে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পর পর আসিরিয়, মিডি, ব্যাবিলন প্রভৃতি সাম্রাজ্যের পতনের পর **কাইরাস** নামক একজন ইরাণী বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। কাইরাস প্রথমে দেশের লোকদের একত্র করে তাদের এক জাতিতে পরিণত করেন। তিনি যে রাজবংশ স্থাপিত করেন তাকে বলে 'একিমিনিড-বংশ'। তিনি ইরাণীয়দের তিনটি জিনিস শিখিয়েছিলেন—

ঘোড়ায় চড়তে, তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে, আর সত্য কথা বলতে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়ার পোষাক পরে তারা যুদ্ধ করত। কাইরাস তাঁর সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, আসিরিয়া এবং ব্যাবিলন জয় করেন। সম্ভবত ভারতবর্ষও তিনি আক্রমণ করেছিলেন। কাইরাস রাজ্য জয় করে সেখানে যাতে উন্নতি হয় তার ব্যবস্থা করতেন। এই ইরাণীরা দেশ জয় করে তাদের ভাল জিনিসগুলো শিখে নিত। ব্যাবিলন জয় করে তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করতে শিখেছিল। মিশর জয় করে মন্দিরের কারুকার্য তারা শিখেছিল। তারপর তারা নিজেদের দেশে চমৎকার সব শহর গড়ে তুলতে আরম্ভ করে।

এরপর ইরাণের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন দারায়ুস। তাঁর সময়েই ইরাণের সভ্যতার সব থেকে বেশী উন্নতি হয়েছিল। তাঁর আমলে ইরাণের অধীনস্থ দেশের লোকেরা সবচেয়ে বেশী সুবিচার ও ভাল ব্যবহার পেয়েছিল। সম্রাট দারায়ুসের সাম্রাজ্য ভারতের সিন্ধুনদের উপকূল ভাগ থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল 'পার্সেপোলিস'। তাঁর বিশাল প্রাসাদের দেওয়াল ছিল দামী কাঠের তৈরী। সেই কাঠের ওপর সোনার পাত বসানো ছিল। সে প্রাসাদে ব্যবহার করা হত বহুমূল্য ভারতীয় সিল্কের পর্দা। প্রাসাদের ছাদ ছিল রূপোর। যে পালঙ্কে দারায়ুস শুতেন সেটা দেখতে ছিল খুব সুন্দর ও সোনার তৈরী। তাতে বসানো ছিল সবুজ রং-এর দামী-দামী হীরা, সেগুলো দেখতে ছিল আসল আঙ্গুরের মত। তার সেনাবাহিনী ছিল বিরাট এবং এতে বিভিন্ন দেশের লোক ছিল। কিন্তু গ্রীকদের কাছে তার বাহিনী হেরে যায় 'ম্যারাথনে'র যুদ্ধে। এ সংবাদ পাওয়ার কিছুদিন পর তিনি মারা যান। এরপরে একিমিনিড বংশের রাজাদের সাথে গ্রীকদের আরো যুদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাসিডনের রাজা গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার এই সাম্রাজ্য জয় করেন।

জরথুষ্ট্র : প্রাচীনকালে পারসিকরা ভারতে আর্যদের মত সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি দেবতার পূজো করত। কিন্তু জরথুষ্ট্র

ছিলেন এই প্রকৃতি পূজোর বিরুদ্ধে। সম্ভবতঃ এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বে জরথুষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর জন্ম ও জীবন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিত আবার তাঁকে 'পৌরাণিক দেবতা' বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একজন 'ধর্ম সংস্কারক'। তাঁর ধর্মশাস্ত্রের নাম '**আবেস্তা**'। এর কিছু অংশ (গাথা) এখনও আছে। তাঁর মতে একজন মহান প্রভু '**আহুরমজদা**' আছেন ; যিনি আকাশ, পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে দিন-রাত্রি, আলো-আঁধার—সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু চলছে। আর এই অহুরমজদার সহচর হচ্ছে কতকগুলো গুণ। যথা—সৎচিন্তা, ন্যায়, দয়া, মঙ্গলকামনা, অমরত্ব প্রভৃতি। জরথুষ্ট্র আহুরমজদার সাথে আরেক অশুভশক্তির বিরোধের কথাও বলেছেন। এই বিরোধে শেষ পর্যন্ত অশুভশক্তির পরাজয় হয়েছিল। মোটকথা জরথুষ্ট্র তাঁর ধর্মে নীতিবাদ বা আদর্শকে উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সকলকে ন্যায়পথে, সত্যের পথে পরিচালিত করতে। মানুষের জীবন যাতে ভাল হয়, সুন্দর হয়, মানুষ যাতে সুখে ও শান্তিতে থাকে সেই চেষ্টাই ছিল তাঁর ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইহুদী (হিব্রু)

ইহুদী বা হিব্রুরা প্রথমে ছিল যাযাবর জাতি। এদের নেতা ছিলেন **আব্রাহাম**। এরা আরব দেশে বাস করত। তারা বসবাসের জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াত। শেষে তারা ক্যানান নামক স্থানে বসবাস শুরু করে। এই ক্যানানের বর্তমান নাম 'ইসরায়েল'। এই ইহুদীদের নানান কাহিনী 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' বা 'হিব্রুদের বাইবেলে' লেখা আছে।

মিশরে হিব্রুদের অবস্থান ঃ এই ওল্ড টেস্টামেণ্টে আছে কি করে

হিব্রুরা মিশরে বন্দী হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল এবং পরে কি করে মোজেস বা মুশার নেতৃত্বে তারা মিশর থেকে মুক্তি পেল।

এই ইহুদীরা প্রচুর ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশু পালত। একবার তাদের বাসভূমি ক্যানানে প্রচণ্ড খরা হওয়ায় তারা খুব অসুবিধায় পড়েছিল। তারা খাবার ও পশুদের চারণভূমির জন্য ঘুরতে ঘুরতে মিশরে এসে প্রবেশ করে। সেই সময় তাদের সাথে মিশরীয়দের যুদ্ধ হয়।

মিশরের রাজা ফারাও তাদের পরাজিত করে বন্দী করেন। তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়। এই ইহুদীদের জীবনে শুরু হয় নানান দুঃখ-কষ্ট। এদের কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং তাদের ভীষণভাবে খাটান হত। এদের দিয়ে ইঁট তৈরী করান হত, পাথর টানানো হত এবং নানান পরিশ্রমের কাজ করান হত। এদের ওপর অত্যাচারও করা হত।

মোজেস ও দাসত্ব থেকে হিব্রুদের মুক্তি ঃ অবশেষে এদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এক মহাপুরুষ যাঁর নাম 'মোজেস' বা 'মুশা'। মোজেসের মা জন্মের পর তাঁকে ঘাসের তৈরী একটা বাক্সে করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর ছেলেকে রাজার লোকেরা মেরে ফেলবে। মজার বিষয় হল যে, সেই বাক্সটা নদীতে ভাসতে ভাসতে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সেটাকে দেখতে পায় ফারাওয়ের মেয়ে। সে তখন মোজেসকে নিয়ে যায় এবং নিজের ছেলের মত এ ছেলেটিকে পালন করতে থাকে। মোজেস যখন বড় হয়ে ওঠেন তখন একদিন ঈশ্বর তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। স্বপ্নে ঈশ্বর তাঁকে বলেন যে মোজেসকেই ইহুদীদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে।

মোজেস তখন মিশরের রাজা বা ফারাওকে অনুরোধ করেন ইহুদীদের মুক্তি দিতে। কিন্তু ফারাও তাঁর অনুরোধ রাখেননি। মোজেস ছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। তাঁর অনুরোধ না শোনার ফলে মিশরে নাকি ভগবানের অভিশাপ নেমে আসে। প্রত্যেক পরিবারের বড় ছেলে মরে যায়। ফারাও তখন ভয় পেয়ে যান। তিনি তখন ইহুদীদের

মুক্তিদেন এবং মোজেসের নেতৃত্বে মিশর ছেড়ে যেতে ইহুদীদের অনুমতি দেন। এর পর মোজেসকে ঈশ্বর 'দশটি' আদেশ দেন যাকে বলা হয় বিখ্যাত **'টেন কমাণ্ডমেন্টস্'**। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ কাহিনী আছে। এই দশটি আদেশ ছিল দশটি আইন। এর দ্বারা মোজেস ইহুদীদের জীবন-যাত্রা যাতে সুন্দর হয় তার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর তারা আরো চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ-প্যালেস্টাইনে ক্যানান দেশ আক্রমণ করে অধিকার করে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। এখানেই গড়ে উঠেছিল ইহুদীদের সভ্যতা। 'জেরুজালেম' গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত শহর ও পবিত্র স্থান হিসেবে। এদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **সলোমন**, যাঁর নাম বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান রাজা হিসাবে আজও স্মরণীয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রীস দেশের ইতিহাস

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে যে উপদ্বীপটি আছে, তার নাম গ্রীস। এই দেশের গ্রীস নামটা দিয়েছে রোমানরা। গ্রীসের লোকেরা নিজেদের **'হেলেন'** নামে একজন পূর্বপুরুষের বংশধর বলে মনে করত। আর নিজেদের দেশকে তারা বলত 'হেলাস'। এই গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতাও ছিল খুব উন্নত। বর্তমানে ইউরোপীয় সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি প্রায় সব কিছুই প্রাচীন গ্রীসের দান। এই গ্রীক সভ্যতা কিন্তু ঈজিয়ান সাগরের ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। এই প্রাচীন ক্রীট সভ্যতা ছিল খুব উন্নত। এই সভ্যতা ছিল মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সভ্যতার সমসাময়িক। এই সভ্যতার নাম 'ঈজিয়ান-সভ্যতা'। প্রায় তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্রীট প্রস্তর যুগ থেকে ধাতু যুগে প্রবেশ করেছিল। ক্রীটের বিখ্যাত নগর ছিল 'ক্লাসাস' ও 'ফিস্টাস্'। এখানে প্রকাণ্ড দুটো প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছিল। ক্রীটের নানান রঙের মাটির বাসন বিখ্যাত ছিল। ক্রীটের লোকেরা লিখতে জানত। তাদের বর্ণমালা ছিল। এই উন্নত ঈজিয়ান

সভ্যতা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই সভ্যতার শেষের যুগকে বলা হয় 'মাইসিনিয়ান-সভ্যতা'। এর কেন্দ্র ছিল পেলোপোনেসাস বা



দক্ষিণ গ্রীস। এ সভ্যতার লোকেরা লোহার ব্যবহার জানতো। পরবর্তীকালে গ্রীকেরা ঈজিয়ান-শক্তির ক্ষমতা খর্ব করে এই উচ্চাঙ্গের ক্রীট সভ্যতাকে আপন করে নেয়। তাই এই গ্রীক সভ্যতা ক্রীট বা ঈজিয়ান-সভ্যতার কাছে অনেকাংশে ঋণী।

হোমারের যুগ ঃ এই গ্রীক সভ্যতার যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরের ট্রয়নগরীতে উন্নতমানের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। গ্রীকদের সাথে ট্রয়নগরীর যুদ্ধের অমর কাহিনী ও অন্যান্য কাহিনী লেখা আছে অন্ধ গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্য **ইলিয়ড** ও **ওডিসিতে**। গ্রীসের প্রাচীন উপকথা ও কাহিনীকে অবলম্বন করে মহাকবি হোমার ঐ দুইটি মহাকাব্য রচনা করেন খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে। গ্রীক উপনিবেশ কিওস দ্বীপে মহাকবি হোমার খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে হোমার যে যুগের ছবি তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর। এই যুগে গ্রীসে ছোট

ছোট অনেক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন মাইসিনের রাজা এগামেমনন। এই রাজারা জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দেবতার কাছে ষাঁড় বলি দিতেন। দেশে শান্তি বজায় রাখতেন। এই রাজারা কিন্তু পরিচালিত হতেন একটি সভার দ্বারা। এই সভার সদস্য থাকতেন অভিজাতরা। আর এই সভার সিদ্ধান্তকে অনুমোদিত করিয়ে নিতে হতো সাধারণ লোকদের দ্বারা গঠিত পরিষদের কাছ থেকে। এখানকার অভিজাতরা খুব বিলাসী ছিল। কিন্তু তারা খুব অতিথিপরায়ণ ছিল। এখানকার লোকেরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজো করতো।

নগর ও রাষ্ট্র ঃ গ্রীস দেশটি ছিল পাহাড়-পর্বতে ভরা। এর মাটিও চাষের পক্ষে ভাল ছিল না। যাতায়াতের রাস্তাও সেই সময় বিশেষ ছিল না। ফলে এখানে ছোট ছোট আলাদা আলাদা স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকের নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল। গ্রীকদের স্বভাব ও কাজকর্মের ওপর প্রকৃতির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। গ্রীসের ইতিহাস বলতে এই সব নগর-রাষ্ট্রের আলাদা আলাদা কাহিনীর সমষ্টিকে বোঝায়। এই নগর-রাষ্ট্রগুলোতে প্রথম গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রকাশ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীসের প্রধান প্রধান নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে 'এথেন্স', 'স্পার্টা', 'করিন্থ', 'থিবস্', 'ম্যাসিডন' প্রভৃতি বিখ্যাত ছিল।

সাংস্কৃতিক বিকাশ ঃ যদিও গ্রীসদেশ ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক একতা ছিল না, তথাপি গ্রীকেরা শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের সভ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের ভাষাও ছিল গ্রীক ভাষা। এক রক্ত, এক ভাষা ও সাহিত্য, এক সামাজিক আচার-ব্যবহার, এক ধর্ম তাদের মধ্যে যেমন ঐক্য স্থাপন করেছিল; তেমনি খেলা ধূলা, বিশেষ করে অলিম্পিক ক্রীড়া তাদের জাতীয় ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। সমস্ত গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলো থেকে এই অলিম্পিক খেলায় যোগ দেবার জন্য খেলোয়াড় আসত। গ্রীকদের মধ্যে ঐ খেলার

সম্মান ও গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। বর্তমান কালের বিশ্ব অলিম্পিকের সূচনা ঐ গ্রীক অলিম্পিক খেলা থেকেই।

উপনিবেশ: গ্রীস দেশে আঙ্গুর ও জলপাই হতো। কিন্তু এখানে খাদ্যের অভাব ছিল। গ্রীকরা নানা কারণে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। এর পেছনে একটা বড় কারণ ছিল গ্রীসদেশের ভৌগোলিক অবস্থা। এই দেশ পাহাড়ে ভরা এবং এই দেশের মাটি ছিল কাঁকুরে। চাষের পক্ষে মোটেই ভাল ছিল না। এই দেশের তিনদিকেই সমুদ্র। এছাড়া এই দেশের ধারে ধারে সমুদ্র অনেকখানি ঢুকে গেছে। কিন্তু এদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং এরা খুব সাহসীও ছিল। তাই এরা খাদ্যের জন্য ও বাণিজ্যের জন্য জলপথে বেরিয়ে পড়েছিল ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগরের নানান দ্বীপে। এইভাবে এরা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বিভিন্ন জায়গায়। ট্রয় নগরীর সম্পদ, ধাতু ও উন্নত সভ্যতা গ্রীকদের সম্ভবত আকর্ষণ করেছিল। গ্রীকরা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিল। তাদের অনেকেই ধনীগোষ্ঠীর শাসন পছন্দ করত না। তাই অনেকে দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ইটালী এবং সিসিলিতেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

এরপর গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল 'এথেন্স' এবং 'স্পার্টা'।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এথেন্স ও স্পার্টা

এথেন্স হচ্ছে গ্রীসদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আর স্পার্টা হচ্ছে দক্ষিণ গ্রীসে অবস্থিত। এই দুটি রাষ্ট্রকে দু'জন বিখ্যাত লোক নূতনভাবে গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা হলেন স্পার্টার **লাইকারগাস**, আর এথেন্সের **সোলন**। কিন্তু এই এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১ অব্দে এই যুদ্ধ আরম্ভ

হয়েছিল)। এই যুদ্ধের নাম 'পেলোপোনেসীয় যুদ্ধ'। এই যুদ্ধের ফলে এথেন্সের বিশাল সাম্রাজ্য যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, স্পার্টাও তেমনি ধ্বংস হয়েছিল।

এথেন্সের সমাজ-জীবন ঃ এথেন্সের লোকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। অভিজাত শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল কৃষি-মজুর। এরা অন্যের জমি চাষ করে জীবন ধারণ করত। এই মজুরদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। এথেন্সের ব্যবসায়ীরা ছিল ধনী। টাকার প্রচলন এখানে ছিল। কিন্তু মজুরদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সাধারণ লোকেদের মনে ভীষণ বিক্ষোভ ছিল। 'ড্রেকোনের' নেতৃত্বে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এই আইন ধনীদের স্বার্থকেই রক্ষা করেছিল। গরীবদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। দেনার দায়ে তাদের সর্বস্ব ধনীদের কাছে বিকিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তারা ক্রীতদাসে পরিণত হতে লাগল। সাধারণ মানুষ এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিদ্রোহের দিকে এগোতে লাগল। এখন সেই অবস্থা থেকে **'সোলন'** তাঁর সংস্কারের মাধ্যমে এক নূতন অবস্থার সূচনা করলেন।

সোলন গরীবদের সমস্ত বন্ধকী দলিল নাকচ করে দিলেন। তাদের ঋণ মকুব করে দিলেন। আর ঋণের দায়ে যারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল তাদের সে অবস্থা থেকে মুক্ত করলেন। ধনীদের জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিলেন। এভাবে তিনি এথেন্সের লোকেদের জীবনে এক নূতন জোয়ার এনে দিলেন। তার প্রচেষ্টায় এথেন্সের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি দেখা গেল। গ্রীক সভ্যতার ক্ষেত্রে তাই সোলনের অবদান বিরাট।

এথেন্সের রাজনৈতিক জীবন ঃ সোলন এথেন্সের রাজনৈতিক কাঠামোরও পরিবর্তন এনেছিলেন সুন্দরভাবে। গ্রীসের অন্যান্য নগরীর মত এথেন্সেও পূর্বে রাজতন্ত্র ছিল। পরে আস্তে আস্তে অভিজাত-তন্ত্র ও শেষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এথেন্সে। ইহার

জন্যও সোলনের দান সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁর আইন সংস্কার এথেন্স গণতন্ত্রের পথকে সুগম করেছিল। এথেন্সেই প্রথম পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমস্ত নাগরিকরা সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হত। সেই সভায় সব বিষয় আলোচনা হত। সকলে নিজ নিজ মত প্রকাশ করত। তারপর তারা সিনেটের সদস্য নির্বাচিত করে দিত যারা নগরের শাসনকার্য চালাত। তাই সোলনকে ইউরোপের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে স্বীকার করেছেন ঐতিহাসিকরা। এইভাবে গণতন্ত্র আস্তে আস্তে এক উন্নত অবস্থায় পৌছেছিল **ক্লাইস্থিনিস ও পেরিক্লিসের** সময়। আর পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের নৌ-সাম্রাজ্য যেমন বিরাট আকার ধারণ করেছিল, তেমনি বহু জ্ঞানী ও গুণীজনের আবির্ভাবে এথেন্সে গ্রীক সভ্যতা এক সুবর্ণ যুগ স্থাপন করেছিল।

স্পার্টার সামাজিক জীবনঃ গ্রীসদেশের আরেক নগর-রাষ্ট্র স্পার্টার সমাজ জীবনও ছিল অদ্ভুত। সমস্ত স্পার্টা ছিল যেন যুদ্ধের শিবির। আর স্পার্টার লোকেরা প্রত্যেকে ছিল এক একজন সৈনিক। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল শৃঙ্খলাবোধ। এসবের মূলে ছিলেন **লাইকারগাস** নামে এক ব্যক্তি। তিনি স্পার্টানদের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। ফলে স্পার্টানরা হয়ে উঠেছিল স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। এরা খুব সাহসী ও বীর ছিল। তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে থাকত। এসবের একটা কারণ ছিল। স্পার্টানরা মনে করত তাদের চারিদিকে শত্রু। স্পার্টা-নগরীর চারিদিকে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস ও অসন্তুষ্ট প্রজারা। এর জন্য অবশ্য দায়ী ছিল স্পার্টাই।

স্পার্টার লোকেদের শিক্ষা, জীবিকা, জীবনযাত্রা, বিয়ে—সব ব্যাপারই ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। স্পার্টায় দুর্বল, রুগ্ন শিশুর স্থান ছিল না। পাহাড় থেকে ফেলে তাদের মেরে ফেলা হত। কুড়ি বছর বয়সে শিক্ষাশেষে প্রত্যেককে সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে হত। সে তখন বিয়ে করতে পারত। স্পার্টার মেয়েদেরও কঠোর

নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হত। তাদেরও ব্যায়াম ও শরীর চর্চা করতে হত 'বীরমাতা' হওয়ার জন্য। স্পার্টায় আইন করে সোনা-রূপোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। লোহার টাকার প্রচলন ছিল। স্পার্টানরা খুব সরল ছিল। তাঁরা বীর যোদ্ধা ছিল। বিলাসিতা ছিল তাদের কাছে বিষবৎ নিষিদ্ধ। এভাবেই তারা সৈন্যের জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

স্পার্টার রাজনৈতিক জীবনঃ স্পার্টার সমাজ-জীবন যেমন অদ্ভুত তেমনি তাদের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল অদ্ভুত। সেখানে রাজতন্ত্র ছিল, ধনতন্ত্র ছিল, আবার গণতন্ত্রও ছিল। স্পার্টায় দু'জন রাজা ছিলেন। রাজার ক্ষমতা ছিল সীমিত। দু'জন রাজা এবং নগরের বয়স্ক ও গুণীজনদের নিয়ে একটা পরিষদ ছিল। এই পরিষদ ছিল সর্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত। পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করত গণসভা। ত্রিশবছরের যে কোন নাগরিক এই গণসভার সভ্য হতে পারত। আরও অনেক বিভাগ ছিল। রাজা যাতে যা খুশী তাই করতে না পারে তার জন্য তার উপর নজর রাখা হত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এথেন্স ও স্পার্টার সংঘর্ষ

স্পার্টা স্থলযুদ্ধে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। স্পার্টার নেতৃত্বে পেলোপোনেসীয় রাষ্ট্রসংঘ গড়ে উঠেছিল। করিন্থ রাষ্ট্রও শেষে এতে যোগ দিয়েছিল। এদিকে এথেন্সও নৌশক্তিতে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ডেলস্ সংঘের মাধ্যমে। এথেন্স ক্রমে ক্রমে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। অবশ্য এ সবের আগে গ্রীকদের বহুবার যুদ্ধ করতে হয়েছিল পারস্য সম্রাট দারায়ুস ও জারাক্সিসের সঙ্গে। সমস্ত গ্রীসদেশকে বার বার পারস্যের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গ্রীকরা মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছে। আর এ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তারা ডেলস্ সংঘ গড়ে তুলেছিল। তার নেতা

ছিলেন এথেন্স। বার বার গ্রীকদের কাছে হেরে পারস্যের রাজারা আর গ্রীসদেশ আক্রমণ করতে আসেনি। কিন্তু নানা কারণে এথেন্স ডেলস্ সংঘকে নিজের নৌশক্তিকে বাড়াবার কাজে লাগাতে পেরেছিল। আর সে সুযোগে এথেন্স নিজের নৌশক্তিকে বাড়িয়ে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

কিন্তু এথেন্সের এ কাজকে অন্যান্য গ্রীকরা সহ্য করতে পারেনি। বিশেষ করে স্বাধীনচেতা গ্রীকরা এথেন্সের আক্রমণাত্মক কাজকে মোটেই পছন্দ করেনি এবং স্পার্টার নেতৃত্বে অন্যান্য গ্রীকরা এথেন্সের শক্তি খর্ব করবার জন্য যুদ্ধ করেছিল এথেন্সের বিরুদ্ধে। স্পার্টার নেতৃত্বে পেলোপোনেসীয় রাষ্ট্রসংঘ একদিকে ছিল। আরেক দিকে ছিল এথেন্স ও তার মিত্র রাজ্যগুলো। এই যুদ্ধের নাম পেলোপোনেসীয় যুদ্ধ (আরম্ভ হয়েছিল ৪৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) এবং এই যুদ্ধ বহুদিন চলেছিল। এই যুদ্ধের ফলে এথেন্স ও স্পার্টা উভয়ই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে উত্তর গ্রীসের ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ ও তাঁর ছেলে আলেকজাণ্ডার ঐক্যবদ্ধ গ্রীক সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

এথেন্সের সাংস্কৃতিক ইতিহাস

সাহিত্য ও শিল্পঃ এথেন্স পেরিক্লিসের যুগে সবদিকে খুব উন্নতিলাভ করেছিল। বিশেষ করে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি নানান বিষয়ের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। পেরিক্লিসের যুগকে তাই এথেন্সের স্বুবর্ণযুগ বলা হয়। পেরিক্লিসের পরেও বেশ কিছু দিন সেখানে জ্ঞানচর্চ্চা, সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা চলেছিল। এথেন্সের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির এই উন্নতির জন্য অনেকে পেরিক্লিসের যুগকে ভারতের গুপ্ত যুগ বা ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **সক্রেটিস**।

নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে সফক্লিস, ইউরিইপাডিস, অ্যারিস্টফেনিস প্রভৃতি অনেক গুণীব্যক্তি ছিলেন। শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ নাম ছিল ফিডিয়াল ও ইকটিনাসের। পেরিক্লিস এথেন্সে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, দেবমূর্তি, দেবমন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। সুন্দর সুন্দর রাজপথ তৈরী করা হয়েছিল, যার দু'ধারে গাছ লাগান হয়েছিল। এথেন্সের লোকেরা ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা এবং ইতিহাস চর্চাও করত। এইভাবেই এথেন্সে এক অত্যন্ত উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

গ্রীক লেখকরা সুন্দর সুন্দর নাটক রচনা করেছিলেন। প্রথম দিককার নাটকগুলোর বিষয়বস্তু ছিল দেব-দেবী। পরে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়েও অনেক নাটক লেখা হয়েছিল। এই নাটকগুলোর মধ্যে বেশীরভাগ ছিল দুঃখের নাটক। অবশ্য কিছু কিছু ছিল হাসির নাটক বা প্রহসন।

আর 'ইকটিনাস' যে বিখ্যাত পার্থিননের মন্দির তৈরী করেছিলেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন। দেবী এথেনার মন্দির ছিল এটি! এই মন্দিরের ভিতরে পাথরের ওপর যিনি সুন্দর কারুকার্য করেছিলেন তাঁর নাম ফিডিয়াস। দেবী এথেনার মূর্তি তিনিই তৈরী করেছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

গ্রীকদের ধর্ম

গ্রীকরা নানান দেবদেবীর পূজো করত। তারা যা কিছু বিচার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারত না তাকেই দেবতার কাজ বলে মনে করত। তারা পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, গ্রহ, তারা প্রভৃতিকে পূজো করত। তাদের দেব-দেবীর বিভিন্ন নাম ছিল। পরবর্তীকালে যে সমস্ত রোমানরা এখানে এসেছিল তারাও একইভাবে গ্রীক দেব-দেবীর পূজো করত। গ্রীকদের দেবী **'এথেনা'** ছিলেন রোমানদের

রোমানদের **'মিনার্ভা'**। গ্রীকদের **'জিউস'** ছিলেন রোমানদের **'জুপিটার'**।

গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে **'জিউস'** ছিলেন সমস্ত দেবতাদের রাজা। তিনি বাস করতেন অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায়। সেখান থেকে তিনি অন্য দেবতাদের আদেশ দিতেন। তাই অলিম্পাস পর্বত-গ্রীকদের কাছে ছিল অত্যন্ত পবিত্র। গ্রীকরা আরও বিশ্বাস করত যে সেই পর্বতে অন্যান্য দেবতাদেরও বাস ছিল। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন জিউসের স্ত্রী এথেনা। তিনি ছিলেন জ্ঞানের দেবী। 'এপোলো' ছিলেন সূর্যের দেবতা। ডায়না ছিলেন চাঁদ, বন ও শিকারের দেবী। এই রকম আরো অনেক দেবতার মধ্যে ছিলেন মার্কারী, ভেনাস প্রভৃতি।



গ্রীকদেবী এথেনা

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রেষ্ঠ গ্রীকগণ

যে সমস্ত কৃতীসন্তান গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের মধ্যে এথেন্সের জননায়ক পেরিক্লিস, নাট্যকার সফক্লিস, দার্শনিক সক্রেটিস ও ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন।

পেরিক্লিস: গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ ছিল এথেন্সে 'পেরিক্লিসের যুগ'। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি যেমন ছিলেন পণ্ডিত, বক্তা, তেমনি ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। রাজনীতিও তিনি খুব ভাল জানতেন। তাঁর ক্ষমতা ও গুণের

জন্যই তিনি এথেন্সের জননায়ক হতে পেরেছিলেন এবং সর্বোচ্চ পদে বহুদিন বহাল ছিলেন। তাঁর সময়ে এথেন্স শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্পও সংস্কৃতিতে বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল। আবার তাঁর সময়ই শুরু হয়েছিল পেলোপোনেসীয় যুদ্ধ। তাঁর মৃত্যুতে এথেন্স হারিয়েছিল এক মহান নেতাকে।


পেরিক্লিস

সফক্লিস ঃ পেরিক্লিসের সময় এথেন্সের বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন সফক্লিস। তিনি অনেক দুঃখের নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠনাটক ছিল 'এ্যান্টিগণ'। তিনি এথেন্সের কাছে কোলোনাস পল্লীতে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন পেরিক্লিসের বন্ধু। সফক্লিসের নিজের জীবন ছিল খুব দুঃখের। সে যুগে গ্রীকনাটকে সাধারণ মানুষের স্থান ছিল না। তাই মানুষের দুঃখ-কষ্টকে তিনি দেবতার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। তার নাটকের দেব-দেবীরা মানুষের মতই হাসতো, কাঁদতো।

সক্রেটিস ঃ সক্রেটিস ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক ও পণ্ডিত। তিনি খুব রসিক লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও মতবাদ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার পক্ষপাতি ছিলেন। এমনি খুব সাদাসিধা ছিলেন। দেখতে ছিলেন বেঁটে ও মোটা। তিনি অতি সাধারণ পোষাক পরতেন। তাঁর একটা মাত্র কোট ছিল। সেটাই তিনি সব সময় পরতেন। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন।


সক্রেটিস

আর যাকে সামনে পেতেন তাকেই ধরে জ্ঞানের কথা শোনাতেন। তিনি বলতেন মানুষ বড় হয় জ্ঞানে, পোষাকে নয়। সক্রেটিসকে অনেকে সম্মান করত ও ভালবাসত। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট কথায় অনেকে তাঁর উপর রেগে যেত। বিশেষ করে যুবকদের তিনি উপদেশ দিতেন স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনা সম্বন্ধে, তাতে অনেকের ধারণা হল যে তিনি দেশের যুবকদের রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ আনল এবং বিচারে সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড হল। ইচ্ছে করলে সক্রেটিস ক্ষমা চেয়ে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি 'হেমলক' বিষপান করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন ন্যায় ও সত্যের পূজারী। অন্যায় বা অসত্যের কাছে কোন দিন মাথা নোয়ান নি।


হেরোডোটাস

হেরোডোটাস: হেরোডোটাসকে বলা হয় ইতিহাসের স্রষ্টা। গ্রীক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর লেখা বই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের পুরানো সংবাদকে তাঁর লেখার মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর লেখার কায়দাও ছিল অপূর্ব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাসিডন

এথেন্স ও স্পার্টার পতনের পরে উত্তর গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা ফিলিপ প্রথমে ছোট ছোট গ্রীকরাজ্য গুলোকে জয় করে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যপুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ম্যাসিডনের রাজা হন। তিনি রাজা হবার কিছুকাল পরে (৩৩৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে) দিগ্বিজয়ে বার হন এবং মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য

নামক এক রাজার কাছে। অবশ্য উত্তর-পশ্চিম ভারতের আরও কিছু অংশও জয় করেন আলেকজাণ্ডার। তিনি শেষে আর অগ্রসর হননি। অবশেষে দেশে ফিরে যাওয়ার পথে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ব্যাবিলনে অসুস্থ হয়ে মারা যান।



আলেকজাণ্ডার

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ফলে গ্রীস দেশ ছোট ছোট কয়েকটি রাজ্যে পরিণত হয়। এদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। প্রায়ই কলহ লেগে থাকত। ঐক্য না থাকার দরুন ক্রমেই তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে আস্তে আস্তে এই গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন হয়।

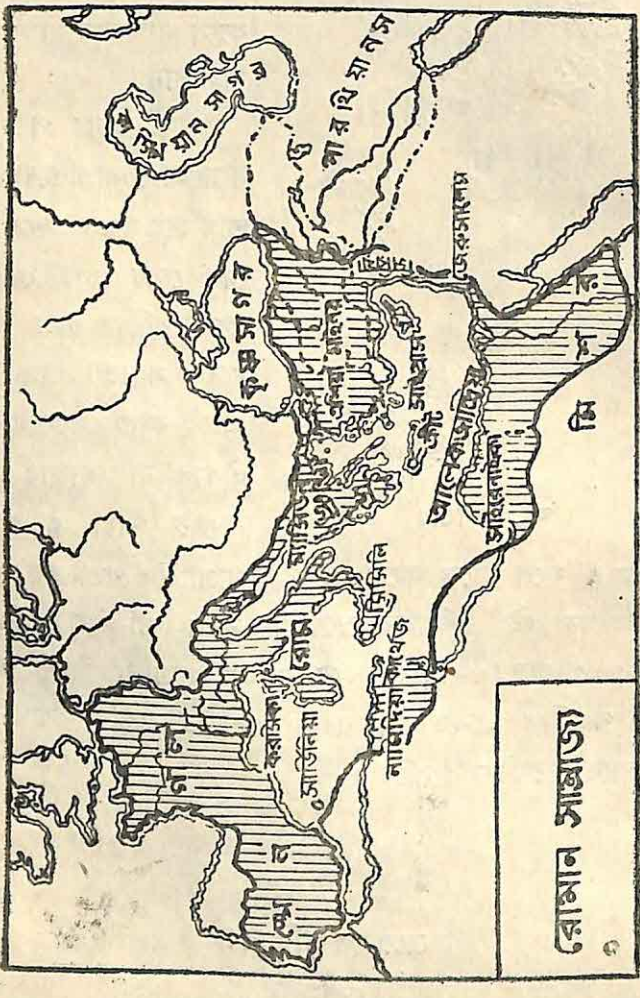
গ্রীকদের এই দুর্বলতার সুযোগে নূতন শক্তিতে শক্তিমান রোমানরা গ্রীকদেশ আক্রমণ করে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তার করে। গ্রীকরা পরাজিত হলেও তাদের ভাবধারা ও সংস্কৃতি রোমানদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রোম

রোমের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ইতালীর রোম নগরীকে কেন্দ্র করে। রোমও প্রথমে নগর-রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে রোমানরা শক্তিশালী হয়ে বিশাল রোম সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই সাম্রাজ্য

ইউরোপ ও আফ্রিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। রোমানরা গ্রীস অধিকার করেছিল। গ্রীকসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এক অত্যন্ত উন্নত রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। রোমের আইনের আজও অনেক নাম।



রোমের আদি কথাঃ শোনা যায় যে, রোম নগরী নাকি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন **রোমুলাস ও রিমাস** নামক দু'ভাই। এই রোম নগরী গড়ে উঠেছিল সাতটা পাহাড়ের চূড়ার ওপর। এই নগরটা ছিল

ব্যবসার কেন্দ্র। বিশেষ করে ঘোড়ার ব্যবসা বা বেচাকেনা হত এখানে। এই রোমের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে **টাইবার** নদী। আর এই জায়গাটা ছিল বেশ নিরাপদ। কিন্তু **ইত্রাস্কান** নামে এক জাতি আদি ইতালীয়দের পরাজিত করে সেখানে শাসন করতে থাকে। এই ইত্রাস্কানদের বিরুদ্ধে ল্যাটিন জাতি লড়াই করেছিল অনেক দিন ধরে। অবশেষে এই ল্যাটিন জাতি ইত্রাস্কানদের হঠিয়ে দিয়ে ৭৫৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রোম নগরীতে রাষ্ট্রের প্রবর্তন করে। রোমানরা ইত্রাস্কানদের নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলে মনে করত। কিন্তু এই ইত্রাস্কানরাই রোমে মন্দির গড়ে ছিল, রোমনগরীকে সুন্দর করে তৈরী করেছিল। কাজেই রোম নগরীকে গড়ে তুলতে তাদেরও অবদান ছিল।

এদিকে অনেক অসুবিধা ও বিপদের মধ্যে কাটালেও রোমানরা শেষপর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গড়তে পেরেছিল। কারণ তাদের ছিল দেশপ্রেম, একতা ও অধ্যবসায়। তাদের স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বের অনেক কাহিনী আছে। এই ল্যাটিন জাতি বা রোমানদের লড়তে হয়েছিল ইত্রাস্কান ছাড়াও গল্, পাহাড়ী-জাতি স্যামনাইট প্রভৃতির সাথে। এই সমস্ত যুদ্ধে জিতে রোমানরা মধ্য ইতালীতে শাসন চালাতে লাগল। কিন্তু ইতালীর দক্ষিণ অঞ্চলে গ্রীকদের সাথে তাদের ভীষণ যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত রোমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করল এবং আস্তে আস্তে রোমানরা সমস্ত ইতালীর প্রভু হয়ে বসল।

কার্থেজের সাথে রোমানদের যুদ্ধঃ সমস্ত ইতালি অধিকার করে রোমানরা থেমে থাকেনি। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে যায়। তারা তখন ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে। এর ফলে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে কার্থেজ নগরীর সাথে তাদের যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই কার্থেজ নগরী ছিল ফিনিসিয়দের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ। কার্থেজের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ ও সম্পদের মালিক হয়েছিল। এদের সভ্যতাও ছিল খুব উন্নত। ভূমধ্যসাগরের অনেক অঞ্চলে,

সিসিলির পশ্চিম অংশে এবং ইউরোপের অনেক স্থানে কার্থেজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

এই কার্থেজও রোমের শক্তি বৃদ্ধিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু রোমানরা পশ্চিম সিসিলির দিকে নজর দিলে কার্থেজের সাথে রোমানদের যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধ অনেক বছর ধরে চলেছিল। তিনটে বড় বড় যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলোকে বলা হয় **'পিউনিক যুদ্ধ'**। এই যুদ্ধ ছিল তাদের জীবন-মরণের যুদ্ধ।

কার্থেজে বার্কা-পরিবার নামে এক বিখ্যাত পরিবার ছিল। এই পরিবারের বীরদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন **হামিলকার** ও তাঁর ছেলে **হানিবল**। এই হানিবল ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। পিউনিক যুদ্ধগুলোর মধ্যে হানিবলের সাথে রোমানদের যুদ্ধই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ (২৬৪—২৪১ খ্রীঃ পূঃ) হয় সিসিলি নিয়ে। এই যুদ্ধে কার্থেজই হেরে যায়। কিন্তু এতে তাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ (২১৮—২০২ খ্রীঃ পূঃ) হানিবল রোমানদের খুব বেকায়দায় ফেলেছিলেন। তিনি অতিকষ্টে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করেন এবং হঠাৎ উত্তর ইতালি আক্রমণ করেন। রোমানরা এতটা বুঝতে পারেনি। তারা একটার পর একটা যুদ্ধে হারতে থাকে। টিসিনাসের যুদ্ধ, ক্যানির যুদ্ধ এবং আরো অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে হানিবল রোমানদের পরাজিত করেন। তাঁর সামরিক প্রতিভা, রণকৌশল, ক্ষিপ্রগতি রোমানদের দারুণ বিপদে ফেলে। এই অবস্থায় আরো বিপদ দেখা দিল দক্ষিণ ইতালিতে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায়। এই বিদ্রোহীরা ছিল রোমানদের চিরশত্রু **স্যামনাইটগণ**। আবার অধিকাংশ গ্রীকনগর যোগ দিল হানিবলের পক্ষে। প্রায় ষোল বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল ইতালি, স্পেন ও সিসিলিতে।

শেষে রোমান সেনাপতি **মার্সেলাস** সাইরাকিউস অধিকার

করলে এবং ইতালিতে বেনিভেন্টামের যুদ্ধে হানিবলকে রোমানরা পরাজিত করলে রোমানদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। বিদ্রোহী নগর ক্যাপুয়াকে রোমানরা আবার অধিকার করে। আর **সিপিও** নামে একজন প্রতিভাবান সেনাপতির নেতৃত্বে রোমানরা স্পেনে কার্থেজের সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দেয়। এদিকে হানিবল দেশ থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ায় অসুবিধায় পরলেন। হানিবলের ভাইও উত্তর ইতালিতে রোমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। ফলে হানিবল রোমজয়ের আশা ত্যাগ করেন। তখন কার্থেজের ঘর সামলানো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কারণ রোমান সেনাপতি সিপিও সিসিলি জয় করে কার্থেজ নগরী আক্রমণ করেন।

কার্থেজের এই বিপদের মধ্যে আরো বিপদ দেখা দিল। কারণ এই সময় প্রজারা বিদ্রোহ করল। এই বিপদের দিনে হানিবল দেশকে বাঁচাবার জন্য দক্ষিণ ইতালি থেকে চলে আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বিখ্যাত **জামার যুদ্ধে** সিপিও হানিবলকে পরাজিত করলেন। কার্থেজ সন্ধি করতে বাধ্য হলো। ফলে কার্থেজ পরিণত হলো রোমের করদ রাজ্যে।

হানিবল কিন্তু তখনও চুপ করে বসে ছিলেন না। তিনি আবার চেষ্টা করতে লাগলেন রোমের উপর প্রতিশোধ নেবার। রোম এতে কার্থেজের উপর রেগে গেল এবং কার্থেজকে আত্মসমর্পণ করতে বললো। হানিবল তখন পালিয়ে গিয়ে সিরিয়া, ক্রীট ও অন্যান্য রাজাদের রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য বলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। রোমানরা তাঁকে তাড়িয়ে ফিরতে লাগলো। শেষে অসহায় হানিবল আত্মহত্যা করেন (১৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে)। কিন্তু রোম কার্থেজের উপর প্রতিশোধ নিল মারাত্মক ভাবে (তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধে (১৪৯—১৪৬ খ্রীঃ পূঃ) সমস্ত কার্থেজ বাসীরা আপ্রাণ যুদ্ধ করেও নিজেদের দেশকে রোমানদের হাত থেকে বাঁচাতে পারলো না। কার্থেজ নগরীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিল রোমানরা। অবশ্য কার্থেজ বা

ফিনিসিয়দের উন্নত সভ্যতার কিছু প্রভাব দেখা গিয়েছিল রোমানদের মধ্যে। রোমের সমাজ জীবনেও এই যুদ্ধের কিছু প্রভাব দেখা গিয়েছিল।

প্রাচীন রোমের সমাজ ব্যবস্থা ঃ প্রাচীন রোমানরা ছিল মিশ্রিত জাতি। তাদের মধ্যে ল্যাটিন অংশই ছিল প্রধান। অনেক বিদেশী এদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এদের মধ্যে ইত্রাস্কান জাতিও ছিল। রোমান সমাজে সাধারণতঃ দু'শ্রেণীর কথা জানা যায়। একছিল উচ্চ বা ধনী শ্রেণী, আর দ্বিতীয় ছিল দরিদ্র শ্রেণী। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যবসায়ীরাও ছিল। এই উচ্চ শ্রেণীর লোকরা সব রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু গরিবরা ছিল সবরকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের মধ্যে অনেকে আবার অভিজাতদের বাড়িতে ভৃত্যের কাজও করত। তবে কর্মকারেরা বর্ম, অস্ত্র প্রভৃতি বানাত। আর ছিল কিছু শিল্পী ও কারিগর।

সমাজে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বাস করত বড় বড় বাড়িতে। তাদের বাড়িগুলো ছিল খুব সাজান এবং নানান রকমের কাজকরা। তাদের বাড়িতে জলের ব্যবস্থাও ছিল খুব ভাল। কিন্তু সমাজে কৃষক, কারিগর ও অন্যান্যদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাদের প্রয়োজনে আবার সেনবাহিনীতেও যোগ দিতে হত।

রোমানরা খেলা-ধূলো করত। তাদের কাছে প্রিয় ছিল কুস্তি, বলখেলা, ব্যায়াম প্রভৃতি। রোমানরা বলবান নাগরিক হওয়ার জন্য শরীরচর্চ্চা করত। তাদের উৎসবের দিনে রথ বা চারচাকার গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা হত। মল্লযুদ্ধ হতো। আবার পশুর সাথে মানুষ লড়াই করে খেলা দেখাত।

রোমানরা কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পোযাক পড়ত। বিশেষ বিশেষ সময়ে তারা উলের পোযাক পরত, যাকে বলা হত 'টোগা'। স্ত্রীলোকেরা লম্বা গাউন পরতো পা পর্যন্ত। তারা খুব সৌখীন ছিল। নানান রকমের সুগন্ধী জিনিস ও গয়না তারা ব্যবহার করত সাজবার

জন্য। রোমানরা সন্ধ্যায় তাদের প্রধান খাওয়া খেতো। তারা খেতো মাংস এবং রুটি। ধনীরা খুব ভোজন বিলাসী ছিল।

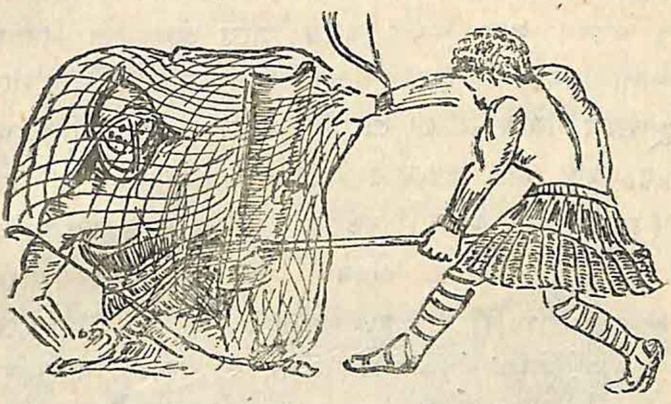
প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান : রোমানদের সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ-শ্রেণীদের বলা হয় 'প্যাট্রিসিয়ান' ও সাধারণ গরীব মানুষদের বলা হয় 'প্লিবিয়ান'। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল রোমের আদিম ল্যাটিন অধিবাসী। প্লিবিয়ানদের মধ্যে ছিল নানান ধরনের লোক। প্লিবিয়ানরা গোড়ায় প্যাট্রিসিয়ানদের খুব অনুগত ছিল। কিন্তু পরে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ তারা ছিল সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উপরন্তু প্যাট্রি-সিয়ানরা তাদের হেয় চোখে দেখতো ও অনেক সময় অত্যাচারও করত। তারা মুক্ত নাগরিকের অধিকার লাভ করেও বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নি। ক্রমে অনেক বিদেশী এসে প্লিবিয়ানদের সংখ্যা বাড়ায়। শেষে তাদের এই লাঞ্ছনা ও শোষণের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ালো। প্রায় দু'শো বছর ধরে লড়াই করে প্লিবিয়ানরা অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল। তারা নানান আইনের সাহায্যে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই আইনগুলোর মধ্যে **"দ্বাদশ দফা আইন"** বিশেষ বিখ্যাত। ক্রমে প্লিবিয়ানরা রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তার পদ বা কন্সাল পদের অধিকারীও হয়েছিল। তাদের এই অধিকার লাভের সংগ্রাম ছিল শান্ত ও সংযত।

রোমান নাগরিকত্ব : রোমে যারা বাস করত বা রোমান নগর-গুলোতে যারা বাস করত, তারা সকলেই কিন্তু রোমের নাগরিক হতে পারত না। রোমের নাগরিক ছিল পুরানো ত্রিশটি ল্যাটিন গোষ্ঠীর লোকেরা। আর নাগরিক ছিল রোমান বংশজাতরা, যারা বাস করত রোমকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উপনগরী গুলোতে। আবার অন্যান্য রোমান নগরগুলোতে যারা ভোটাধিকার পেয়েছিল তারাও ছিল রোমান নাগরিক। অবশ্য এদের মধ্যে সকলের সমান অধিকার ছিল না। আরো দেখা গেছে যে, রোম যে সমস্ত ল্যাটিন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল

সেখানকার লোকেরা রোমান নাগরিকত্ব পেত না। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকে রোমে এসে বসবাস করতে পারত এবং রোমান নাগরিককে বিয়ে করতে পারত। এরা রোমে ভোটাধিকার পেত। আবার রোমান নাগরিকদের মধ্যে যারা ঐ সমস্ত ল্যাটিন উপনিবেশগুলোতে চলে যেত তারা রোমান নাগরিকত্ব হারাত।

দাসত্ব ও স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ : কার্থেজের পতনের পর রোমান সাম্রাজ্য আরো ছড়িয়ে পড়ল। গড়ে উঠল রোমের অনেক উপনিবেশ। কিন্তু এর ফলে রোমের সমাজ জীবনে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করতে লাগল অভিজাতরা। অভিজাতরাই রোমের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে সব থেকে লাভবান হল। এদের মধ্যে অনেকে আবার ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বাড়িয়ে প্রচুর সম্পদের মালিক হল। অপরদিকে যুদ্ধের জন্য দীর্ঘদিন বাইরে থাকার ফলে রোমের কৃষকদের জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যদিও বা তারা চেষ্টা করে ছিল কিন্তু গরীব কৃষকরা অভিজাতদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠল না। কারণ অভিজাতরা ক্রীতদাসদের দিয়ে খুব সস্তায় চাষবাস করাতে লাগল। সেখানে সাধারণ কৃষকদের বেশী মজুরী দিয়ে শ্রমিক খাটাতে হত। রোমের কৃষক ও কারিগরদের অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল, কারণ রোমের অভিজাতরা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে প্রচুর খাদ্য-শস্য ও বিলাসদ্রব্য আমদানি করতে লাগল। তারা নিজেরা সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগবিলাসে বাস করতে লাগল। আর এর ফলে স্বাধীন কৃষক, কারিগর প্রভৃতি আস্তে আস্তে পরিণত হল ধনী-অভিজাতদের ক্রীতদাসে। তারা খাটতে লাগল এই অভিজাতদের ক্রীতদাস হিসেবে। রোমের এই সমাজ ব্যবস্থা ও নাগরিক জীবনে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন **তাইবেরিয়াস ও কেইয়াস** নামে দুই ভাই। কিন্তু স্বার্থান্বেষী অভিজাতরা তাদের হত্যা করল। ক্রমে এই ক্রীতদাসদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চলল ভীষণ ভাবে। না মরা পর্য্যন্ত তাদের নিস্তার ছিল না। এদের

মধ্যে অবশ্য কিছু ছিল পরাজিত দেশের বন্দী। তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে বীরত্ব দেখাত তাদের বলা হত **গ্ল্যাডিএটর**। এদের মধ্যে অনেকে মুক্তি পেত।



রোমের ক্রীতদাস বা গ্লাডিএটর

কিন্তু ক্রীতদাসরা অভিজাতদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই শেষ পর্যন্ত তারা **স্পার্টাকাসের** নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছিল ক্যাপুয়ায় ৭৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। স্পার্টাকাস ছিলেন একজন গ্ল্যাডিএটর। তার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল প্রায় নব্বই হাজার ক্রীতদাস। তারা দক্ষিণ ইতালির বিরাট অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল এবং রোমান বাহিনীকে পরাজিতও করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষপর্যন্ত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং রোমান সেনাপতি **মারকাশ ক্রশাস**-এর কাছে পরাজিত হয়। ব্যর্থ হয় এই বিরাট ক্রীতদাস বিদ্রোহ। কথিত আছে, দু'হাজার স্পার্টাকাশের দলের লোক বন্দী হয়েছিল এবং তাদের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. (

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জুলিয়াস সীজার

রোমে ভীষণভাবে দলাদলি চলতে থাকলে সাধারণতন্ত্রের পতন ঘনিয়ে আসে। সমস্ত ক্ষমতা আস্তে আস্তে চলে গেল কয়েকজন শক্তিশালী সেনাপতির হাতে। এদের মধ্যে **মেরিয়াস, সুল্লা, পম্পে** ও **জুলিয়াস সীজার** ছিলেন প্রধান। সাহস ও ক্ষমতার দিক থেকে সীজারের মত লোক তখনকার দিনে বড় একটা ছিলনা। তিনি গল্ (ফ্রান্স) জয় করেন। বর্তমান জার্মানীর কিছু অংশ অধিকার করেন। বৃটেনকে দু'বার আক্রমণ করেছিলেন ৫৫ ও ৫৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তিনি মিশর ও অন্যান্য জায়গা দখল করে রোমসাম্রাজ্যের সীমানা আরো বাড়িয়েছিলেন।



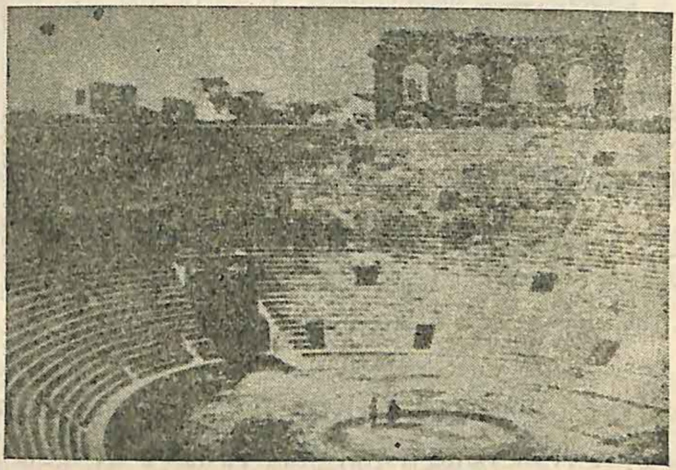
জুলিয়াস সীজার

সাধারণ-তন্ত্রের অবসান ঃ সীজারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আশংকিত হন আরেকজন সেনাপতি। তাঁর নাম ছিল **পম্পে**। কিন্তু শেষপর্যন্ত সীজার পম্পেকে যুদ্ধে হারিয়ে দেন এবং নিজেই রোমের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এর ফলে সাধারণতন্ত্রের অবসান হয় এবং রোমে প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় একনায়কতন্ত্র। সীজার অবশ্য সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন নি। তিনি স্বেচ্ছাচারীও ছিলেন না, পরন্তু সুশাসকের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি গরীবদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সাহিত্য ভালবাসতেন। নিজে বৃটেন অভিযানের নানান কাহিনী লিখে গেছেন। তিনি ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতাকে সিনেটের অনেকে পছন্দ করল না। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল তাঁরই বন্ধু **ব্রুটাসের** নেতৃত্বে 'কেসিয়াস' ও আরো

অনেকে। তারা হত্যা করল (৪৪ খ্রীঃ পূঃ) সীজারকে সাধারণতন্ত্র রক্ষার জন্য। কিন্তু সীজারকে হত্যা করে তারা মারাত্মক ভুল করল। কারণ এর পর রোমে শুরু হল আরো বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধ। খ্রীষ্টপূর্ব ৪২ অব্দে ফিলিপ্পির যুদ্ধে ব্রুটাস ও অন্যান্যরাও পরাজিত হয়েছিল। তার ফলে রোমে সাধারণতন্ত্রের অবসান হল।

নূতন সাম্রাজ্য ঃ রোমে প্রতিষ্ঠিত হল নূতন সাম্রাজ্য বা সম্রাটদের যুগ। প্রথম সম্রাট হলেন সীজারের ভাগ্নে **অক্টেভিয়াস্**। তিনি সম্রাট হয়ে **'অগাষ্টাস'** উপাধি গ্রহণ করেন।

সম্রাট অগাষ্টাসের আমলে রোমের অনেক উন্নতি হয়েছিল। রোমে সেই সময় খেলা ধূলা হতো। এই সব খেলার জায়গার মধ্যে

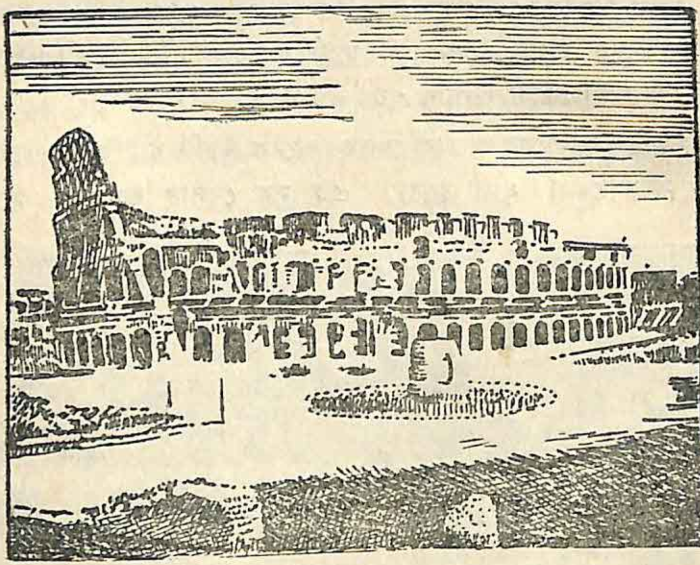


এ্যামফিথিয়েটার

'এ্যামফিথিয়েটারও' ছিল। সেখানে ষাঁড়ের লড়াই, সিংহের, বাঘের এবং মানুষের সঙ্গে এই সমস্ত জন্তুর লড়াই হতো।

সম্রাট অগাষ্টাসের পর রোমে একের পর এক সম্রাট রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে কুখ্যাত ছিলেন সম্রাট নীরো। এই নীরোর সময় তৈরী হয়েছিল বিখ্যাত 'স্বর্ণগৃহ'। পরে সম্রাট ভেসপাসিয়ান এই স্বর্ণগৃহ ভেঙ্গে এরই এক অংশে তৈরী করেন বিখ্যাত কলোসিয়াম। ইহা পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন। ইহা ছিল পৃথিবীর

বৃহত্তম রঙ্গভূমি। এখানে খেলা দেখাত গ্ল্যাডিএটররা। বিভিন্ন জন্তুর লড়াই এবং তাদের সাথে মহিষের লড়াইও দেখান হতো এখানে। তাছাড়া খ্রীষ্টান বা দাসদের এর ভিতর জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে সিংহ ছেড়ে দেওয়া হতো। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ওপর থেকে এই দৃশ্য দেখতেন।



কলোসিয়াম

বিভিন্ন রোমান সম্রাটদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সম্রাট **কনষ্টানটাইন**। তিনি ভালভাবে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করবার জন্য এই সাম্রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল 'রোম'। আর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী করা হয়েছিল **'কনষ্টাণ্টিনোপল'**। এই পূর্ব সাম্রাজ্যকে বলা হতো 'বাইজেনটাইন' সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্যের পতন ঃ কনষ্টানটাইনের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক **গিবন্‌স্** সুন্দরভাবে এই সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, রোমানরা অলস হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে দুর্নীতি ভালভাবে বাসা বেঁধেছিল, তারা নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল বিশৃঙ্খলা।

কোন দেশ, সাম্রাজ্য বা জাতির পতন নিশ্চিত হয়ে যায় যখন তার নৈতিক শক্তি আর থাকেনা। রোমানরা অত্যাচার করতে লাগল অধিকৃত অঞ্চলের লোকেদের। ফলে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। বিশাল সাম্রাজ্যকে শাসন করার মত আর কোন সম্রাটও ছিলেন না রোমে। বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল এবং তারা স্বাধীন হয়ে যেতে লাগল। ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে লাগল। পূর্ব সাম্রাজ্য যদিও বা টিকে ছিল। কিন্তু ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল বৈদেশিক আক্রমণের ফলে।

খ্রীষ্টানধর্মের উত্থান ঃ রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও সেখানে আরেকটি জিনিসের উত্থান ঘটেছিল তা'হল 'খ্রীষ্টান ধর্ম'। রোমানদের অনেক উপনিবেশ ছিল, সেখানে অনেক ইহুদী খ্রীষ্টান বাস করত। 'সেন্টপল' এবং 'সেন্টপিটার' রোম সাম্রাজ্যের অনেক অংশে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেন্টপিটারই ছিলেন রোমের 'প্রথম পোপ'। খ্রীষ্টানরা ক্রমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহ্য করতে পারল না। তারা তাদের যীশুকেই একমাত্র ভগবান বলে প্রচার করতে লাগল। কিন্তু খ্রীষ্টানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল। দলে দলে খ্রীষ্টানদের হত্যা করেছিলেন রোমান সম্রাটরা। এদের মধ্যে নীরোর নিষ্ঠুরতা ছিল সবথেকে বেশী। কিন্তু তবুও খ্রীষ্টানরা ধর্ম ছাড়েনি। শেষে রোমান সম্রাট কনষ্টানটাইন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সময় খ্রীষ্টানধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গণ্য হয় ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরে এই খ্রীষ্টান ধর্ম আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চীন

মহান শাং বংশ ঃ প্রাচীনকালে চীনবাসীরা দেশের শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার জন্য একজন রাজা ঠিক করে নিয়েছিল। রাজাকে তারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত, কিন্তু তাঁকে কখনো পূজো করত না। এই ভাবেই চীনে গড়ে উঠেছিল শাং বংশ (১৭৬৬—১১২২ খ্রীঃ পূঃ)।

এই শাং বংশের প্রতিষ্ঠা করেন **চেং ট্যাং** (খ্রীঃ পূঃ ১৭৬৬)। রাজা ট্যাং ছিলেন অতি ভাল লোক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তিনি মানুষকে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি পশু-পাখীকেও ভাল বাসতেন। প্রজারা যে সমস্ত ভাল কাজ করত, তার জন্য তাদের মর্যাদা দিতেন। তিনি নিজের অপরাধকেও ক্ষমা করতেন না। তিনি ছিলেন চীনের রাজাদের কাছে আদর্শ।

কথিত আছে যে, পর পর সাত বছর বৃষ্টি না হওয়ার ফলে সেখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজা ট্যাং প্রজাদের দুঃখে সাদা পোষাক পরেছিলেন এবং জনগণের মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে আত্মবলিদান করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু দেবতার পূজো শেষ হওয়ার পর অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। শুরু হলো বৃষ্টি। দেশ আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

তাঁর পর শাং বংশের আরও অনেক রাজা রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন **চৌ-সিন**। এই চৌ-সিন অত্যন্ত নিষ্ঠুর লোক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত আছে যে চৌ-সিন স্বর্গকে করত অশ্রদ্ধা আর প্রজাদের করত অত্যাচার। কেউ কোন অপরাধ করলে তিনি তাকে ও তার আত্মীয়স্বজনদেরও কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি উচ্চবংশের ছেলেদেরই কর্মচারী নিয়োগ করতেন। বহু সাধু ও ভাল লোককে পুড়িয়ে মেরেছেন। এই রকম আরও বহু নিষ্ঠুরতার কাহিনী আছে। এই সব নিষ্ঠুর কাজে তাঁকে উৎসাহ দিতেন তার স্ত্রী। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে চৌ-সিনকে আগুনে পুড়েই মরতে হয়েছিল। আর তার রাণীকে হত্যা করা হয়েছিল। চৌ-সিন মাঝখানে ভালভাবে রাজ্যশাসন করছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর আবার তার নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু হল। লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তার অত্যাচারে। দেখা দিল বিদ্রোহ। এর ফলে শাং বংশের পতন হয় এবং চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় **'চৌ-বংশ'**।

কনফুসিয়াসঃ প্রাচীন চীনের মহাপুরুষদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন **কনফুসিয়াস ও লাও-সে**। 'কনফুসিয়াস' হচ্ছে ল্যাটিন নাম। চীনা নাম 'কুয়াং ফুজি'। ৫৫১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে লু রাজ্যের

চুফু নগরে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। মায়ের কাছে তিনি ছোটবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরে তিনি আরো পড়াশুনা করেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। ক্রমে কনফুসিয়াসের পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পরে। লুর শাসনকর্তা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করলেন। শেষে ৪৭৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কনফুসিয়াস মারা যান।

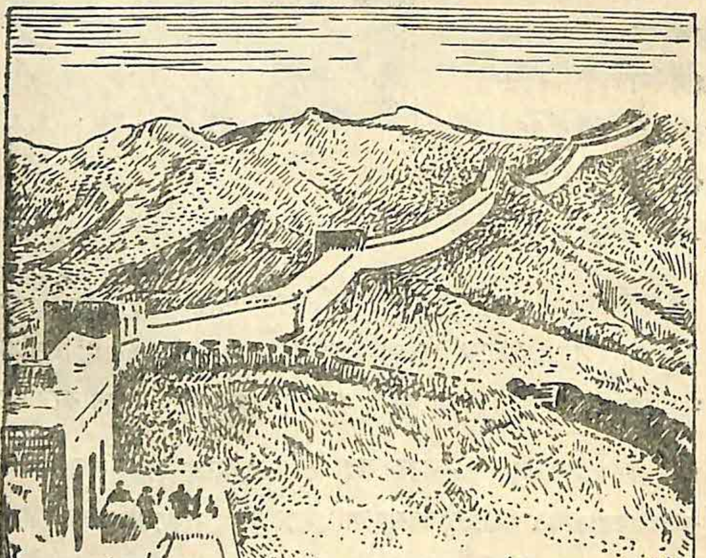


কনফুসিয়াস

তাঁর শিক্ষা ঃ কনফুসিয়াস চেয়েছিলেন তাঁর চিন্তা ধারা, আদর্শ ও শিক্ষার দ্বারা সমাজকে পরিবর্তিত করতে। তাঁর এই চিন্তাধারা ও আদর্শগুলিকেই পরে লোকেরা ধর্মীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছিল।

কনফুসিয়াস বললেন,—সকলের উচিত গুরুজনকে সম্মান করা, পূর্ব-পুরুষদের শ্রদ্ধা করা, নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা, সকলের সাথে সকলের ভদ্র ব্যবহার করা। তিনি আরো বলতেন মানুষের অপরের ভালটা দেখে শিখে নেওয়া উচিত। তা হ'লে সে ভালভাবে, এবং সৎভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। তাঁর প্রধান শিক্ষা ছিল "অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার তুমি পেতে চাও না, অপরের সঙ্গে সে ব্যবহার কখনো করোনা"। কনফুসিয়াস ভগবান সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। তিনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথাও কিছু বলেন নি। তিনি এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাতে সুন্দর হয় সে কথাই বলেছেন।

চীনের মহা প্রাচীর ঃ চীনের প্রাচীর পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম। এই প্রাচীর আজও ইতিহাসের অমর সাক্ষী হয়ে আছে। এই প্রাচীর তৈরী করা হয়েছিল চিন বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সি-হুয়াংতির সময়। এই প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ অবশ্য আগেই তৈরী করেছিলেন ছোট ছোট জমিদারগণ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যাযাবর জাতি হূনদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা। সেই একই উদ্দেশ্যে রাজা সি-হুয়াংতি এই মহাপ্রাচীর সম্পূর্ণভাবে তৈরী করেন। এই মহাপ্রাচীরের প্রকৃত নির্মাণকর্তা ছিলেন সেনাপতি 'মেং তিয়েন'। এই প্রাচীর তৈরী করার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল রাজা সি-হুয়াংতির



চীনের প্রাচীর

তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের বিরোধী পণ্ডিতদের বিচ্ছিন্ন করতে। তাঁরা যাতে সংঘবদ্ধ হতে না পারেন, তার জন্য তাদের অনেককে এই প্রাচীর তৈরীর কাজে দূরে দূরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। এই

প্রাচীর বিস্তৃত ছিল চীনের উত্তরদিকে মঙ্গোলিয়ার সীমানা ধরে সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার মাইল।

চীন সাম্রাজ্য: (খ্রীঃ পূঃ ২৫৫—২০৬) চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে 'চীন' নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা চেং ২৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আস্তে আস্তে বিরাট অঞ্চল দখল করে সাম্রাজ্য গঠন করেন। তিনিই চিন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের নাম অনুসারেই দেশের নাম হয় চীন। সম্রাট চেং নূতন নাম গ্রহণ করেন সি-হুয়াংতি। সম্রাট সি-হুয়াংতি ছিলেন চিন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, তাকেই চীনের 'প্রথম সম্রাট' বা 'চীনের নেপোলিয়ন' বলা হয়। তিনি দাবী করতেন যে, তিনি ছিলেন পৌরাণিক রাজা বিখ্যাত হুয়াংতির বংশধর। সম্রাট সি-হুয়াংতির ধারণা ছিল যে, যাঁরা তাঁর আগে রাজত্ব করতেন তাঁরা ছিলেন অপদার্থ। তাই তাঁদের কীর্তিকলাপ লিখে রাখারও কোন দরকার মনে করেন নাই। তিনি মনে করতেন আগেকার লোকেরা কিছু জানত না। সুতরাং তিনি চীনের সমস্ত পুরাণ বই পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন। তাঁর রাজমন্ত্রী লি-সুর পরামর্শে তিনি এই কাজ করেছিলেন। কনফুসিয়াসের বইও পোড়ান হয়েছিল। কিন্তু দেশের পণ্ডিতরা ভাল ভাল বই লুকিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে সেগুলো রক্ষা পেল। শুধু ডাক্তারী, কৃষিবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বইগুলো পোড়াতে বারণ করা হয়েছিল।

এই সি-হুয়াংতির আমলে তৈরী হয়েছিল পৃথিবীর বিখ্যাত চীনের মহাপ্রাচীর। তিনি যা কিছু করতেন, নানানদিক বিবেচনা করেই তা করতেন। তিনি সাম্রাজ্যকে চল্লিশটিভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক ভাগে একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে সুশাসন প্রবর্তন করেছিলেন। মন্ত্রী লি-সু প্রাচীন লেখার পদ্ধতি পাল্টে তাকে আরো সরল করেছিলেন। এর থেকে চীনের বর্তমান অক্ষরগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবে সি-হুয়াংতি চীন সাম্রাজ্যের যে ঐক্যবদ্ধরূপ দিলেন তা চীনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরের রাজাদের

আমলে অরাজকতা চলতে থাকে। 'চেন-সে' নামক একজন লোকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এর ফলে চিন বংশের পতন হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে একটি উপদ্বীপ। এর প্রায় তিনদিকে সমুদ্র এবং উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। এখানে সুপ্রাচীনকালে সিন্ধুনদের আশপাশে গড়ে উঠেছিল 'সিন্ধু সভ্যতা'। আবার পরে সিন্ধু-গঙ্গার উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল 'আর্য সভ্যতা'। এই দুই সভ্যতা মিলে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতের উন্নত সভ্যতা।

আর্যদের ভারতে আগমন : আর্যরা কোথা থেকে এসেছিল সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, আর্যরা ভারতে এসেছিল মধ্যএশিয়া বা কাস্পিয়ান সাগরের আশ-পাশ অঞ্চল থেকে। তারা সঙ্গে করে এনেছিল তাদের পালিত গরু, ছাগল প্রভৃতি পশু। তারা এসেছিল পারস্য ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে সম্ভবত ২৫০০-২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তারা এসে প্রথমে বসবাস আরম্ভ করে পাঞ্জাবের কোন স্থানে। সে জায়গাটাকে তারা বলত **'সপ্তসিন্ধু'**। এখানে সাতটা নদী ছিল। এই নদীগুলোর নাম 'সিন্ধু', 'ঝিলাম', 'চেনাব', 'রাবী', 'বিপাশা', 'শতদ্রু' ও 'সরস্বতী'। আর্যরা দলে দলে এসেছিল। তাদের এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এদের পরাজিত করে তারা ভারতে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তারপর আর্যরা সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং উন্নত গ্রামভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলে। তাদের এই নূতন বাসভূমিকে বলা হয় **'আর্য্যাবর্ত্ত'**।

বেদ : আর্য ঋষিদের শান্ত-সুন্দর আশ্রম ছিল শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার এক সুন্দর পরিবেশ। এই পরিবেশেই রচিত হয়েছিল আর্যদের সব থেকে পুরনো ও বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ, যার নাম '**বেদ**'।

'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। এই বেদের বিভিন্ন শ্লোক ও মন্ত্র এবং বেদের নানান কাহিনী থেকে আর্যদের সম্বন্ধে জানা গেছে। দেবতাদের স্তুতি করে অনেক মন্ত্র রচনা করা হয়েছিল বেদে। এতে ধর্মীয় উৎসব পালনের অনেক নিয়ম-কানুন ও পূজোর আচার-বিধি লেখা আছে। বেদ চার প্রকারের—এই বেদ গ্রন্থগুলোর নাম **ঋকবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ**। আর্যরা মনে করত যে, ঋষিরা ঈশ্বরের বাণী শুনে বেদের এই মন্ত্র বা স্তোত্র রচনা করেছিলেন। তাই বেদের আরেক নাম '**শ্রুতি**'। বংশ পরম্পরায় এইসব স্তোত্র মুখে মুখে চলে আসছিল। পরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল বেদ। আরও পরে সহজ গদ্যে 'ব্রাহ্মণ' এবং উপনিষদ ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল।

আর্যদের সমাজ-ব্যবস্থা : ঋক্ বেদের যুগে আর্যসমাজ ছিল বেশ উন্নত। প্রত্যেক পরিবারের পিতা ছিলেন সর্বে-সর্বা। সকলে তাঁকে মেনে চলত। তাঁকে বলা হতো 'গৃহপতি'। তিনি পরিবারের সকলকে দেখাশুনা করতেন। আর তাঁর স্ত্রী ভৃত্য ও কৃষি-শ্রমিকদের দেখাশুনা করতেন। পরিবারের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা ছিল খুব কঠোর এবং সমাজে বিয়ে ছিল খুব পবিত্র জিনিস। স্ত্রীলোকদের খুব সম্মান করা হত। শিশু-বিবাহ, সতী ও ঘোমটা দেওয়া এই সব সেই সময় ছিল না। মেয়েরা স্বাধীন ছিল। তারা লেখাপড়া শিখত এবং আলোচনা সভায় যোগ দিত।

সাধারণতঃ একজন লোকের একজন স্ত্রী থাকত। কিন্তু বহু বিবাহও ছিল। বিধবারা আবার বিয়ে করতে পারত। সমাজে আর্য ও অনার্যরা বাস করত। আর্যরা অনার্যদের (যাদের তারা পরাজিত করেছিল) বলত দস্যু বা দাস। আর্যরা দেখতে সুন্দর ছিল। তাদের গায়ের রং ছিল ফর্সা। আর অনার্যরা দেখতে সুশ্রী

ছিল না। তাদের গায়ের রং ছিল কালো। এরা ছিল স্থানীয় আদিবাসী। এরা এই গ্রামের একধারে বাস করত। প্রথমে আর্যরা এদের সাথে মেলা-মেশা করত না। কিন্তু পরে তাদের প্রয়োজনেই তারা দস্যু বা দাসদের সাথে মিশতে আরম্ভ করে। দাসেরাও আর্যদের অনেক কিছু মেনে নিয়েছিল।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, ঋক্ বেদের যুগেই আর্য সমাজে চারটি শ্রেণী ছিল—**ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র**। কিন্তু এ নিয়ে মত-বিরোধ আছে।

ধর্মঃ আর্যরা ধার্মিক ছিল। বেদের বিভিন্ন স্তোত্র ও মন্ত্র থেকে তাদের ধর্মীয় আচার-বিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা যায়। দেব পূজোকে তারা মানুষের প্রথম কর্তব্য বলে মনে করত। ঋক্ বেদের যুগে আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বিভিন্ন দেবতা বলে পূজো করত খোলা আকাশের নিচে। তারা যাতে ভাল থাকে, তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও পালিত পশুগুলো যাতে নিরাপদে থাকে—এই সবের জন্য আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাত ও নানান জিনিস অর্পণ করত। এই দেবতাদের মধ্যে ছিল আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, বজ্র, পবন, পৃথিবী, অগ্নি, জল প্রভৃতি আরো অনেক দেবতা। কিছু কিছু দেবতাকে তারা ভয়ও করত। তারা বরুণদেব (জলদেবতা) ও ইন্দ্রদেবকে (বজ্রদেবতা) বিশেষ ভক্তি করত। কারণ এদের ওপর নির্ভর করত শস্য উৎপাদন। আর 'উষা' ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয় দেবী। দেবতাকে খুশী করবার জন্য তারা যাগ-যজ্ঞ করত, পশুবলি দিত এবং যজ্ঞের আগুনে খাবার অর্পণ করত দেবতার উদ্দেশ্যে। তখন কিন্তু তাদের মন্দিরও ছিল না, দেবমূর্তিও ছিল না।

আর্যদের রাজনৈতিক অবস্থাঃ পরিবার ছিল রাষ্ট্রীয় প্রথম অবস্থা। আর্যরা ছোট ছোট দলে ভারতবর্ষে এসেছিল। তারা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তুলেছিল। প্রত্যেক দলের লোকেরা একই পূর্বপুরুষের বংশধর ছিল। প্রত্যেক দলের রাজ্যকে বলা হত '**জন**'। তাদের একজন দলপতি ছিলেন। তাঁকে বলা হত '**রাজন**'। এই

'জন'কে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এক এক ভাগকে বলা হতো 'বিশ'। প্রত্যেক 'বিশ' একজন করে বিশপতির অধীনে থাকত। এই 'বিশ'গুলো ছিল কতগুলো গ্রামের সমষ্টি। গ্রামের কর্তাকে বলা হতো গ্রামনী।

'রাজন' বা 'রাজা' ছিল সবার উপরে। তবে তিনি যা' খুশী তাই করতে পারতেন না। তাঁকে কাজ করতে হতো 'সভা' ও 'সমিতি'র পরামর্শ অনুসারে। এই সভা ও সমিতিতে থাকতেন বয়স্ক জ্ঞানী ও গুণী লোকেরা। রাজন বিচার করতেন। তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। ঋক্‌বেদে দশরাজের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার কথা আছে। এই রাজপদ ক্রমে বংশগত হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবেই রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। ঋক্‌বেদের যুগে 'জন'গুলোর মধ্যে কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, শূরসেন, মৈত্রেয়, কোশল প্রভৃতি আরও অনেক নাম পাওয়া যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মহাকাব্য

ভারতে যে দুটি প্রধান মহাকাব্য রচিত হয়েছে তার একটি হচ্ছে **মহাভারত**, আরেকটি হচ্ছে **রামায়ণ**। এই মহাকাব্যগুলোতে আছে ক্ষত্রিয় রাজাদের নানান কাহিনীও ভারতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। মহাভারত ও রামায়ণের যুগকে বৈদিক যুগের অংশই বলা হয়। এই মহাকাব্যগুলো সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে কাহিনী বা 'গাথার' সমষ্টি থেকে। কবিতা বা গাথার সমষ্টি বলে এদের 'কাব্য' বলা হয়। অবশ্য আমরা জানি যে, মহাভারত রচনা করেছিলেন **ব্যাসদেব**। আর রামায়ণ রচনা করেছিলেন **মহর্ষি বাল্মীকি**।

মহাভারতঃ মহাভারতের মূল কাহিনী গড়ে উঠেছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। এই যুদ্ধ হয়েছিল রাজ্যের অধিকার নিয়ে। তখন হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন পাণ্ডু। তাঁর বড় ভাই ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ ছিলেন বলে ছোট ভাই পাণ্ডু সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডু অকালে মারা গেলে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন।

পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে ছিল। তাদের নাম ছিল যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন নকুল ও সহদেব। এদের মা ছিলেন কুন্তী। এদের বলা হয় পাণ্ডব। আর ধৃতরাষ্ট্রের ছিল একশ ছেলে। দুর্যোধন ছিল বড় ছেলে। এদের মা ছিলেন গান্ধারী। এদের বলা হয় কৌরব বা কুরু। কৌরবরা পাণ্ডবদের ভীষণ ঈর্ষা করত। অশান্তি নিবারণের জন্য ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের দিয়েছিলেন 'ইন্দ্রপ্রস্থ' (বর্তমানে দিল্লীর কাছে) নামে একটি ছোট রাজ্য।

কিন্তু কৌরবরা এতেও সন্তুষ্ট হতে পারল না। তারা চেষ্টা করতে লাগল কি করে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত করবে। এদিকে পাণ্ডবরা কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় খুব দক্ষ ছিল। গুরু দ্রোণাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। কিন্তু দুর্যোধনের মামা শকুনির পরামর্শমত পাশা-খেলায় দুর্যোধন অন্যায় কৌশলে পাণ্ডবদের হারিয়ে দেয়। সর্ত অনুসারে পাণ্ডবদের তের বছরের জন্য রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যেতে হয়। বনবাস শেষে ফিরে এসে পাণ্ডবরা রাজ্য দাবী করলে দুর্যোধন তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। এর পরিণামে যে ভীষণ যুদ্ধ হয় কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে তাকে বলা হয় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ। উভয় পক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যোগ দিয়েছিল। বাসুদেব কৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের পক্ষে। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবদেরই জয় হয়, যাকে বলা হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়। যুধিষ্ঠির হলেন হস্তিনাপুরের রাজা। পাণ্ডবরা পরে অর্জুনের নাতি দ্বিতীয় পরীক্ষিতকে রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে হিমালয় অঞ্চলে মহাপ্রস্থানে চলে যান।

এই মহাকাব্যের মধ্যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির ছাপও আছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করা হয়। কূটনীতি ও যুদ্ধ-নীতির কথা এবং সেই যুগের সমাজব্যবস্থার আভাসও এতে পাওয়া যায়।

রামায়ণ: রামায়ণ মহাকাব্য আকারে মহাভারত অপেক্ষা ছোট। মহাভারতের মত এই মহাকাব্যেও নানান ছোট ছোট উপকাহিনী মূল কাব্যের সাথে পরে যোগকরা হয়েছিল। রামায়ণের

যুগের ঘটনা ও পরিবেশ দেখে মনে হয় যে, এই যুগ ছিল মহাভারতের পরে। রামায়ণের কাহিনীতে দেখা যায় যে, অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তাঁর তিন রাণী ও চার ছেলে ছিল। এই চার ছেলের নাম ছিল রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। রাজা দশরথ তাঁর বড় ছেলে রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন দ্বিতীয় রাণী কৈকেয়ী। এর ফলে রামকে যেতে হল চৌদ্দবছরের জন্য বনবাসে। আর কৈকেয়ীর ছেলে ভরত বসল সিংহাসনে। রামের সঙ্গে গেলেন স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণ। শোকে দশরথ মারা গেলেন। এদিকে ভ্রাতৃভক্ত ভরত রামের পাদুকাযুগল এনে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগল। রাম বিন্ধ্যাঞ্চলে পঞ্চবটী বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই সময় নানান ঘটনা ঘটেছিল। দক্ষিণের লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে যায়। শেষে দীর্ঘযুদ্ধে রাম রাবণকে পরাজিত ও নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করেন। অবশেষে রামেরা অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং রাম অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় রাজ্যে সুখ ও শান্তি ছিল। রামের দুই ছেলে ছিল—লব ও কুশ। তারাই ইক্ষ্বাকু বংশের ধারাকে বজায় রেখেছিল।

রামায়ণের কাহিনী থেকে একটা জিনিস দেখা যায় যে, দক্ষিণ ভারত তথা সিংহল পর্য্যন্ত আর্য সংস্কৃতি বিস্তারলাভ করেছিল। রাম ও রাবণের মধ্যেকার যুদ্ধকে অনেকে মনে করেন আর্য-অনার্য যুদ্ধ বা গঙ্গার উপকূলবর্তী কৃষিভিত্তিক শক্তির সাথে বিন্ধ্যাঞ্চলের খাদ্য সন্ধানী আদিম মানবদের যুদ্ধ। সিংহল বা লঙ্কার কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যা হোক, এই মহাকাব্যের মাধ্যমে সে যুগে ভৌগলিক অবস্থা সম্বন্ধে ভালভাবে জানা যায়—হিমালয় থেকে দক্ষিণভারত পর্য্যন্ত। এই মহাকাব্য থেকে আরো জানা যায় সে যুগে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মোটামুটি চিত্র।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে ভারতে ধর্মীয় জগতে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের অর্থ জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন। ব্রাহ্মণ বা উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মও তাদের মধ্যে নূতন আশা ও শান্তির বাণী শুনিয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্রোহস্বরূপ ছিল এই দুই ধর্ম।

জৈনধর্ম ঃ জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন বর্দ্ধমান মহাবীর। তিনি জন্মেছিলেন ৫৪০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বৈশালীর কাছে কুন্দগ্রামে। তাঁর মনে মানুষের জীবন, জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে কতকগুলো প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি ত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং কঠোর তপস্যা করেন। তিনি শেষে দিব্যজ্ঞানলাভ করেন। তিনি তাঁর ইচ্ছাকে জয় করেছিলেন বলে 'জিন' নাম লাভ করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে বলা হয় **জৈনধর্ম**। তাঁর ধর্ম যারা গ্রহণ করেছিল, তাদের বলা হয় জৈন। দিব্যজ্ঞান লাভের পর তাঁর নাম হয়েছিল 'বর্দ্ধমান মহাবীর'। তিনি ছিলেন ২৪তম তীর্থঙ্কর। তাঁর আগে আরো তেইশ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন। সম্ভবত তেইশতম তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্বনাথ, যাঁর সাথে বর্দ্ধমান মহাবীরের জীবনের অনেক মিল ছিল। বর্দ্ধমান মহাবীর এই ধর্মকে নূতন রূপ দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে এই ধর্মের প্রবর্তক বলা হয়।



মহাবীর

জৈনধর্মের মূল কথা ছিলঃ (১) সৎ বিশ্বাস, (২) সৎজ্ঞান ও (৩) সৎকর্ম। এই তিনটি নিয়মকে বলা হয় 'ত্রিরত্ন'। এর দ্বারা মানুষের নির্বাণ বা মুক্তি সম্ভব বলে জৈনরা বিশ্বাস করত।

সৎকর্ম বলতে বলা হয়েছেঃ (ক) অহিংসা, (খ) সত্য, (গ) আস্তেয়, (ঘ) ত্যাগ ও (ঙ) ব্রহ্মচর্য।

মহাবীর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সৎ-জীবনযাপনের উপর। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। বেদ ও চতুরবর্ণেও তাঁর কোন আস্থা ছিল না। জৈনদের সব থেকে বড় আদর্শ ছিল অহিংসা। জৈনমন্দির, শিল্প ও সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। রাজস্থান, মালব, গুজরাট, মথুরা প্রভৃতি জায়গায় এই সবের নিদর্শন আছে। বর্দ্ধমান মহাবীর পরলোক গমন করেন ৪৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর জৈনদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যায়ঃ (১) শ্বেতাম্বর ও (২) দিগম্বর। আস্তে আস্তে জৈনদের সংখ্যা কমতে থাকে। ভারতে এখনও জৈন-ধর্মাবলম্বী লোক আছে।



গৌতম বুদ্ধ

বৌদ্ধধর্মঃ বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থ। সম্ভবতঃ ৫৬৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি লুম্বিনীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই পরে গৌতমবুদ্ধ নামে খ্যাতিলাভ করেন। লুম্বিনী ছিল কপিলাবস্তুর কাছে শাক্যদের রাজধানী। শিশুকালে সিদ্ধার্থ তাঁর মা, মায়াদেবীকে হারান। তিনি রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়েছেন। কিন্তু মনে কখনও শান্তি পাননি। মানুষের দুঃখ-কষ্ট

তাঁকে বেদনা দিয়েছে। দুঃখ-কষ্ট থেকে মানুষের মুক্তির কথা তিনি চিন্তা করেছেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্ত্রী যশোধারা ও পুত্র রাহুলকে ছেড়ে সত্যের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েন। তিনি বহু জায়গায় ঘুরলেন। কিন্তু কোথাও মনে তৃপ্তি পেলেন না। অবশেষে তিনি গয়াতে এক বটগাছের নীচে সাধনায় বসেন এবং দীব্যজ্ঞান লাভ করেন। তিনি হলেন **বুদ্ধ বা জ্ঞানদীপ্ত**। তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্মের নাম হল **বৌদ্ধধর্ম**। যারা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল তাদের বলা হত বৌদ্ধ। গয়াতে তাঁর সাধনার স্থানে মঠ তৈরী হয়েছিল। তাকে বলা হয় **'মহাবোধি মঠ'**। আর যে বটগাছের নীচে তিনি সাধনা করেছিলেন, তাকে বলা হয় **'বোধিবৃক্ষ'**। বুদ্ধদেব বারাণসীর কাছে সারনাথ, কপিলাবস্তু ও অন্যান্য স্থানে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন।

বুদ্ধও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। তিনি পশুবলিকে নিন্দা করেছেন। তিনি অহিংসা, প্রেম ও সৎপথের কথা বলেছেন। তাঁর চারটি সত্য ছিল ঃ (১) পৃথিবীতে আছে যন্ত্রণা ও দুঃখ, (২) যন্ত্রণা ও দুঃখের কারণ আকাজ্ক্ষা বা কামনা, (৩) কামনাকে জয় করে দুঃখ ও কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ও (৪) কামনাকে জয় করা যায় অষ্টমার্গ বা আটটি পথ মেনে চল্‌লে। এই আটটি পথ হল ঃ (ক) সৎদৃষ্টি, (খ) সৎ আকাজ্ক্ষা, (গ) সৎ বাক্য, (ঘ) সৎ কর্ম, (ঙ) সৎ উপায়, (চ) সৎ চেষ্টা, (ছ) সৎ মানসিকতা ও (জ) সৎচিন্তা।

বুদ্ধদেব সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন অহিংসা, কর্ম ও নির্বাণের উপর। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব তাঁর ধর্মের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না। তবে তারা আত্মার পুনর্জন্মকে বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত কর্ম অনুসারে মানুষের পুনরায় জন্ম হয়। এই বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে ও ভারতের বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল। বর্মা, সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ সাহিত্য ও শিল্প গড়ে উঠেছিল। 'বৌদ্ধজাতক' ও 'ত্রিপিটক' গ্রন্থগুলো হচ্ছে বিখ্যাত বৌদ্ধসাহিত্য। পরে বৌদ্ধদের মধ্যে দুটো ভাগ হয় ঃ

(১) 'হীনযান' ও (২) 'মহাযান'। নানা কারণে এই বৌদ্ধধর্ম ভারতে ধ্বংস হয়ে যায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ঃ মৌর্য সাম্রাজ্য—কুষাণ—গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ

মৌর্য সাম্রাজ্য ও চন্দ্রগুপ্ত ঃ মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তিনিই ভারতে প্রথম বিশাল ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত।



তিনি নন্দবংশ ধ্বংস করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন ৩২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন চাণক্য বা কৌটিল্য

নামে একজন ব্রাহ্মণ। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করে উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করেন। আরো রাজ্য জয় করে তিনি ঐক্যবদ্ধ মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

চন্দ্রগুপ্ত সুবিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য সুন্দরভাবে শাসন করেছিলেন। তাঁর সুদক্ষ সেনাবাহিনী ছিল। সেই সময় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থাও বেশ ভাল ছিল। মৌর্যযুগে কোন চুরি-ডাকাতি ছিল না। **মেঘাস্থিনিস** নামে এক গ্রীক পরিব্রাজকের বর্ণনা থেকে এসব জানা যায়। ভারতের বাইরের গ্রীক রাজ্যগুলোর আগেও মৌর্য সম্রাটদের ভাল সম্পর্ক ছিল।

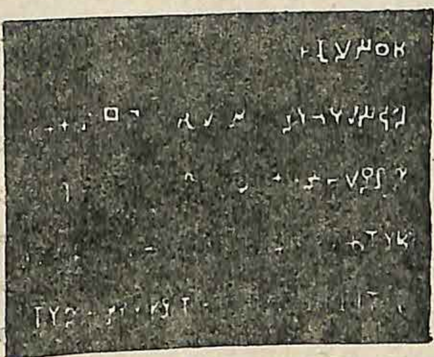
বিন্দুসার ঃ চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর ছেলে বিন্দুসার ২৯৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল। কেবলমাত্র উড়িষ্যার কলিঙ্গরাজ্য ছিল মৌর্যদের ঘোরতর শত্রু।

অশোক ঃ বিন্দুসারের পর সম্রাট হন অশোক। ইতিহাসে তিনি মহামতি রাজর্ষি অশোক নামে বিখ্যাত। অশোক ২৬২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। কিন্তু যুদ্ধের করুণ দৃশ্য দেখে চিরদিনের জন্য তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও ভারতের বাইরে সিংহল ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হয়েছিল। অশোক রাজ্য জয় অপেক্ষা মানুষের হৃদয় জয়কে বড় মনে করেছিলেন। বিভিন্ন শিলালিপিতে তিনি মানব-



অশোক

ধর্মের কথাই প্রচার করেছেন। মানুষকে ভালবাসা, মাতা-পিতা ও গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, এমনকি পশু-পাখীকে ভালবাসা—এই সমস্ত ছিল তাঁর ধর্ম প্রচারের মূল কথা। এই অহিংসা ও প্রেমের বাণীর সাক্ষী তাঁর শিলালিপিগুলো। এগুলো লেখা আছে খরোস্থি ও ব্রাহ্মিলিপিতে। প্রজাদের তিনি সন্তানের মত দেখতেন। মানুষের সেবার জন্য তিনি রাস্তা ঘাট তৈরী করে তার দুপাশে গাছ লাগিয়েছিলেন, কূপ খনন করেছিলেন এবং সরাইখানা তৈরী করেছিলেন। তাই অশোককে বলা হয় রাজর্ষি ও দেবনামপিয়। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে, মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের কতক কারণ ছিল অশোকের অহিংসানীতি কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক তা মানেন না। যাহোক, এর পর এসেছিল শুঙ্গরা। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন 'পুষ্যমিত্র শুঙ্গ'।



অশোকের শিলালিপি (ব্রাহ্মি অক্ষর)

কুষাণ সাম্রাজ্য : এরপর উত্তর পশ্চিম ভারতের দুর্বল রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিল বিদেশ থেকে আসা 'কুষাণরা'। কুষাণরা এখানে রাজত্ব করতে লাগল। এদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন **কণিষ্ক**। কণিষ্ক দ্বিতীয় **কদফাইসের** মৃত্যুর পর ১২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। এই সময় থেকে শকাব্দ গণনা করা হয়। তিনি পুরুষপুরে (বর্তমান পেশোয়ার) রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, ইয়াকান্দ ও খোটান থেকে বারাণসী পর্যন্ত কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেন।

কণিষ্কের সময় বিদেশী সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানধর্মীয় চিন্তা ভারতের

চিন্তাধারার সাথে মিশে এক নূতন ভাবধারার সৃষ্টি করেছিল। গ্রীক ও ভারতীয় ধারা মিশে সৃষ্টি হয়েছিল বিখ্যাত গান্ধার শিল্পরীতি। কণিষ্ক পেশোয়ারে কাঠের একটি স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন যার উচ্চতা ছিল ৪০০ ফুট। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন উন্নতি হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন গুণী ও পণ্ডিতের সমাবেশ ঘটেছিল। এদের মধ্যে 'অশ্বঘোষ', 'বসুমিত্র', 'নাগার্জুন', 'চড়ক' ও 'শুশ্রুত' বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য : কুষাণদের পতনের পর আবার ভারতীয় শক্তির উত্থান হল। প্রতিষ্ঠিত হল **'গুপ্ত সাম্রাজ্য'**। শ্রীগুপ্ত থেকে চন্দ্রগুপ্তের আগে পর্যন্ত তেমন কিছু জানা যায় না। চন্দ্রগুপ্তই গুপ্তসাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে পাটলীপুত্র অধিকার করেন। তিনি **'মহারাজাধিরাজ'** উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি রাজত্ব করতে পারেন নি। ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

সমুদ্রগুপ্ত : চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যপুত্র **সমুদ্রগুপ্ত** সিংহাসনে বসেন। সমুদ্রগুপ্ত গান বাজনা জানতেন। টাকার মধ্যে তাঁর বীণা-বাদনরত মূর্তি পাওয়া গেছে। কিন্তু সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবেও তিনি খ্যাত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায়ই বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এবং পূর্বভারতেও বহুরাজ্য জয় করেন। অবশ্য এদের মধ্যে অনেক রাজ্য কেবল-মাত্র তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল। নেপাল, আসাম, পাঞ্জাব, মালব ও রাজস্থানের রাজ্যগুলো তাঁকে খাজনা দিত। সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে জানা যায় তাঁর সভাকবি **হরিসেনের** এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে। **সমুদ্রগুপ্তকে** বলা হয় **ভারতের নেপোলিয়ন**। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞও করেছিলেন।



সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত : সমুদ্রগুপ্তের পর গুপ্তসম্রাট হন তাঁর ছোট ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫ —৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে ছিলেন। তাঁর আমলে শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকর্মের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। তার নবরত্নসভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন কবি ও নাট্যকার **কালিদাস**। এছাড়া ছিলেন জ্যোতির্বিদ 'আর্যভট্ট', 'বরাহমিহির' প্রভৃতি। পরিব্রাজক ফাহিয়েনের বিবরণ থেকে গুপ্তদের সময়কার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়।

কিন্তু বিক্রমাদিত্য বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্তযুগের পতন আরম্ভ হয়। কুমার গুপ্ত ও পরে স্কন্দগুপ্তের সময় ভীষণ ভাবে হুণরা আক্রমণ চালায়। স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্ত রাজারা আর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারেন না। আস্তে আস্তে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তদের পতন পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং শিলালিপি থেকে কিছু কিছু জানা যায়।

আর্যদের ধর্মগ্রন্থে বাংলার কোন কোন জনপদের উল্লেখ থাকলেও তাদের সাথে বাংলার অধিবাসীদের কোন যোগাযোগ ছিল না। আর্যদের কাছে বাংলার লোকেরা ছিল অনার্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাংলার পুণ্ড্র জাতিকে **'দস্যু'** বলা হয়েছে। এমনকি বাংলায় এলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। Ite (4)

তবে বৈদিক যুগের শেষের দিকে আস্তে আস্তে বাংলায় আর্যদের অনেকে এসে বাস করে। আর্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এখানে প্রসারিত হয়। মহাকাব্যের যুগে দেখা যায় বাংলার প্রতি আর্যদের অন্য ধারনা। মহাভারতে পুণ্ড্র ও বঙ্গ এই দুই জাতিকে **'সুজাত ক্ষত্রিয়'** বলে অভিহিত করা হয়েছে। রামায়ণে আছে যে বাংলা একটা সমৃদ্ধ জনপদ। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীম নাকি রাজ্য বিস্তারের জন্য বাংলায়

এসেছিলেন। আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তারা বঙ্গরাজ্যের সাহায্য পেয়েছিলেন। এমনকি আর্যরা পুণ্য অর্জনের জন্য পুণ্ড্রনগর ও গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে আসতো।

পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে অনেক কিছু উল্লেখ করা আছে। একটি জৈন গ্রন্থে আর্যজাতির তালিকায় বঙ্গ ও রাঢ়ের নাম পাওয়া যায়। আরও জানা যায় যে, শেষ জৈন 'তীর্থঙ্কর মহাবীর' বাংলায় ধর্ম প্রচারের জন্য এসে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন। 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে বিজয়সিংহ নামে এক রাজপুত্রের কথা আছে যিনি সিংহল জয় করেছিলেন। অনেকে মনে করেন বিজয়সিংহ বাংলার রাজপুত্র ছিলেন।

৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ অধিকার করেও পূর্বদিকে আর অগ্রসর হননি। অনেকে মনে করেন মগধের নন্দদের ও বাংলার শক্তির কথা শুনে গ্রীকরা আর অগ্রসর হতে সাহস করেনি। সেই সময়কার গ্রীক লেখকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় 'গঙ্গরিডই' নামে পরাক্রান্ত জাতির কথা, যারা বাংলাদেশের অধিবাসী ছিল। এখানে গঙ্গানদীর তীরে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। অন্যান্য দেশের সাথে এদের ব্যবসা-বাণিজ্যও চলতো।

সম্ভবতঃ মৌর্যযুগে বাংলার কোন কোন অংশে মৌর্যদের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত মহাস্থানগড় শিলালিপি থেকে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে কুষাণ আমলের কিছু কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই মুদ্রার আদান প্রদান ছিল। তবে গুপ্তদের সময় বঙ্গদেশের কিছু অংশ তাদের অধীনে ছিল বলে জানা যায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়ান। সে সময় বাংলাদেশে কতগুলো স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার কাছে শুশুনিয়া পাহাড়ে খোদাই করা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, পুষ্করণের রাজা সিংহবর্মা ও তাঁর ছেলে চন্দ্রবর্মা সেখানে রাজত্ব করতেন। শুশুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তর পূর্বে

দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে পোখনা নামে একটা গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ এটাই ছিল সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার রাজধানী। চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ এই চন্দ্রবর্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন। পূর্বদিকের সমতট ছিল সমুদ্রগুপ্তের অধীনে করদ রাজ্য। পরে প্রায় সমস্ত বাংলাই গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তারপর যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় তখন সেই সুযোগে গৌড়ের রাজা **শশাঙ্ক** বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক যোগাযোগ ও ভারতের সমাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে তার প্রভাব

আর্যরা ভারতে এসেছিল মধ্য এশিয়া থেকে। সিন্ধু সভ্যতার পর আর্যরা গ্রামকে কেন্দ্র করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সমাজে কর্ম অনুসারে শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। পরে জাতিভেদ প্রথাও প্রচলিত হয়েছিল। পশুপালন ও কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা। পরে মধ্য এশিয়া, চীন ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে ভারতের আরো যোগাযোগ ঘটেছিল। এর ফলে অবশ্য এখানকার সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে যায় নি। বরঞ্চ বারবার বিদেশীরা ভারতে এসেছে এবং তারা ভারতীয়দের সাথে মিশে গেছে। তবে এর কিছু প্রভাব অবশ্যই দেখা গেছে সমাজ ব্যবস্থায়। এই যোগাযোগের বিশেষ প্রভাব দেখা গেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। পারস্য সম্রাট কাইরাস (৫৫৮—৫৩০ খ্রীঃ পূঃ) গান্ধার পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এই গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা, যেখানে মিলন ঘটেছিল আর্য ও ইরানী শিক্ষার। বিশেষ ধরনের ইরানী টাকার অনুকরণ করেছিল ভারতীয়রা। আর খরোষ্ঠি লিপি নেওয়া হয়েছিল 'পারসী এ্যারামিক' লিপি থেকে।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর বৈদেশিক যোগাযোগ আরো

বেড়েছিল। এমন কি মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার মাধ্যমে ইউরোপের রোম পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রভাব দেখা গেছে। এর একটি বিশেষ উদাহরণ হচ্ছে **'গান্ধারশিল্প'**। ভারতীয় সমাজে মিশে গিয়েছিল শক্, পহ্লব্, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী জাতি।

আর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিছু কিছু নগর গড়ে উঠেছিল ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে। সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল **'শ্রেষ্ঠী'** বলে এক ব্যবসায়ী-শ্রেণী। গড়ে উঠেছিল ব্যবসায়ী **'গিল্ড'** ও **'শ্রমিক-সমবায় সংস্থা'**। এই গিল্ডগুলোর বিশেষ প্রভাব ছিল সেখানকার সমাজের ওপর। সমাজে এক শ্রেণীর হাতে প্রচুর পয়সা আসায় তাদের মধ্যে ভোগ-বিলাস বেড়ে গিয়েছিল। তারা চার্বাক ঋষির নাস্তিকতা ও বস্তুবাদকে পছন্দ করতে থাকে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন

প্রাচীনকালে ভারতের সাথে মধ্য এশিয়া, চীন প্রভৃতি স্থানের যে যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বিবরণ। মেগাস্থিনিস ভারতে এসেছিলেন মৌর্যযুগে। আর ফা-হিয়েন এসেছিলেন গুপ্তযুগে। গ্রীক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বইটির নাম **'ইণ্ডিকা'**। তবে সে বই পাওয়া যায় না। অন্য বইতে এই বইয়ের বর্ণনার উল্লেখ আছে। তা থেকে সে যুগের কথা জানা যায়। এদের বর্ণনা থেকে সে যুগের সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জানা যায়।

মেগাস্থিনিসের বর্ণনাঃ মেগাস্থিনিসের বর্ণনা থেকে মৌর্য যুগে ভারতের সমাজ জীবন কেমন ছিল তা জানা যায়। সেই সময় এখানকার লোকেরা অত্যন্ত সৎ, সরল ও সুখী ছিল। তারা খুব সাহসী ছিল। এখানে কোন চোর-ডাকাত ছিল না। লোকেরা খুব

কমই বিচারালয়ে যেত। সাধারণতঃ তারা মদ খেত না। ভাত ও দুধের তৈরী জিনিস ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। গৃহ ভৃত্যদের সাথে সাধারণতঃ ভাল ব্যবহার করা হত। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সমাজে জাতিভেদ ছিল। তবে দেশের আইন ছিল অত্যন্ত কঠোর। অপরকে আহত করলে অপরাধীর হাত কেটে নেওয়া হতো। অপরাধ খুব বেশী হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।

সমাজে শ্রেণী-বিভাগ ছিল। কৃষকদের সংখ্যা ছিল সব থেকে বেশী। বন্যা বা খরার সময় এবং আগুন লেগে ক্ষতি হলে সরকার থেকে সাহায্য করা হত। উৎপন্ন শস্যের $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{6}$ অংশ কর হিসেবে সরকারকে দিতে হত। এই সময় শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্যও গড়ে উঠেছিল।

ফা-হিয়েনের বর্ণনা: চীন থেকে ফা-হিয়েন গুপ্তযুগে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এখানকার সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করেছেন। সেই সময় ভারতের লোকেরা বেশ উন্নত, সৎ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করত। তারা আইন মেনে চলত। গুপ্তযুগে আইন ও শাস্তির ব্যবস্থা মৌর্যযুগের মত কঠোর ছিল না। এখানকার লোকেরা বেশীরভাগ ছিল নিরামিষভোজী। সমাজে শ্রেণী বিভাগ ছিল। কিন্তু সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা একত্রে সুখে বাস করত। স্ত্রীলোকদের বিশেষ সম্মান করা হত এবং সমাজে তাদের গুরুত্ব ছিল। এখানকার অনেকে নানান ধরনের সৌখীন জিনিস ব্যবহার করত। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের উন্নতি হয়েছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শিল্প, স্থাপত্যশিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিকাশ

শিল্প ও স্থাপত্যশিল্প: প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা ও স্থাপত্য-শিল্পের মান ছিল খুব উন্নত। সিন্ধু সভ্যতার যুগে নগর পরিকল্পনা, বাড়ি-ঘর, স্নানাগার শীলমোহর ও বিভিন্ন মূর্তি থেকে বোঝা যায়, সে যুগে স্থাপত্যশিল্প ও শিল্প কলা কত উন্নত ছিল।

মৌর্য ও কুষাণ যুগে এই শিল্পধারার উন্নতি দেখা যায় পাটলীপুত্রের কাঠের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, কণিষ্কের মূর্তি ও বিভিন্ন স্তূপ ও স্তম্ভ থেকে। 'সারনাথ স্তূপ' এর এক বিশেষ উদাহরণ হয়ে আছে। গ্রীক ও রোমান শিল্পের সাথে ভারতীয় শিল্প মিশে তৈরী হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিখ্যাত **'গান্ধারশিল্প'**।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল গুপ্তযুগে ও তারপরে। পাহাড়ের গায়ে এবং গুহার মধ্যে খোদাই করে শিল্পীরা অপূর্ব সুন্দর সুন্দর কাজ করেছেন। তারা মূর্তি গড়েছেন, ছবি এঁকেছেন এবং পাহাড় কেটে মন্দির বানিয়েছেন। এই শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজন্তার **গুহাশিল্প,** ইলোরার **শিল্পকলা** ও **কৈলাস মন্দির** এবং কোণারকের **সূর্যমন্দির**। সাঁচীস্তূপ, ভিতরগাঁও, দেওঘরের **দশাবতার মন্দির** এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর ও বুদ্ধের পাথর ও ধাতুনির্মিত মূর্তি প্রাচীন শিল্পের স্বাক্ষর বহন করছে। শিল্পীরা যে কত দক্ষ ছিল এগুলো থেকে তা বোঝা যায়। এছাড়া টেরাকোটা শিল্পের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। গুপ্তযুগের ধাতু শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে দিল্লীর কুতব মিনারের কাছে "লৌহস্তম্ভটি"। আজও তাতে মরচে ধরেনি।



অজন্তার গুহাচিত্র

দক্ষিণ ভারতে অনেক মন্দির গড়ে উঠেছিল। উত্তর ভারতের সাথে তাদের শিল্পরীতির কিছুটা পার্থক্য আছে। এসব বোঝা যায় কাঞ্চির কৈলাশনাথ মন্দির, মামল্লীপুরমের ধর্মরাজের মন্দিরগুলো দেখলে।

সাহিত্য ঃ প্রাচীন ভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। বেদ, বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ছিল প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ। এছাড়া ছিল জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য। মৌর্যযুগে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ছিল একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রাচীন সাহিতের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা যেতে পারে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'। কালিদাস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। এছাড়া 'মাঘ', 'ভারবী', 'ভট্টি', 'বাণভট্ট' থেকে 'কবি জয়দেব' পর্যন্ত বহু কবি-সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটেছে প্রাচীন সাহিত্যে। প্রাচীন রাজ বংশাবলী, ঐতিহাসিক গ্রন্থও ছিল। বিশেষ উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কলহনের 'রাজ তরঙ্গিনী'র কথা। আর হিতোপদেশ, বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ছিল প্রাচীন সাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ।

শিক্ষা ঃ প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর্যযুগে গুরুগৃহে লেখা-পড়া শেখার প্রচলন ছিল। শিক্ষক বা গুরুকে পিতার মত সম্মান করা হত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) জ্ঞানলাভ করা (২) সামাজিক কর্তব্যবোধ জাগান ও (৩) চরিত্র গঠন। সব থেকে জোর দেওয়া হত চরিত্রগঠন ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ওপর। প্রাচীন ভারতে পরে আরেকটি শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল 'বৌদ্ধমঠে'।

শিক্ষার বিকাশের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। সেখানে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, বিভিন্ন শাস্ত্র, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কারিগরীশিক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল 'তক্ষশিলা' ও পরবর্তীকালে 'নালন্দা'। তক্ষশিলায় বহু জ্ঞানী ও গুণী অধ্যাপক ছিলেন। এর খ্যাতি ছিল ভারতের বাইরেও। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়াশুনা করতে আসত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বর্তমান বিহারে। বৌদ্ধমঠের শিক্ষা ব্যবস্থার এক বিশেষ উদাহরণ এই বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার খরচ চলত কয়েকটি গ্রাম থেকে। এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই নালন্দা। সুদূর চীন, কোরিয়া ও তিব্বত থেকে ছাত্ররা আসত এখানে পড়াশুনা করতে। চীন থেকে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন **হিউয়েন সাঙ**। তিনি এসেছিলেন হর্ষবর্দ্ধনের সময়। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব প্রশংসা করেছেন। দশ হাজার ছাত্র এখানে পড়ত। এখানকার অধ্যাপকরা ছিলেন এক একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। হিউয়েন সাঙের সময় বিখ্যাত পণ্ডিত **শীলভদ্র** এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়।

বিজ্ঞান ঃ অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাচীন ভারত বেশ উন্নত ছিল। আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতির নাম আজও সকলে জানে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের চর্চাও তখন হত। অনু-পরমাণুর চিন্তাও নাকি সে যুগের বিজ্ঞানীরা করেছিলেন। আর মহাভারতের **'যতুগৃহ'** বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন ভারতের রসায়ণশাস্ত্রের কথা। এর সঙ্গে দেখা গেছে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি। কণিষ্কের সময় চড়কের লেখা 'চড়ক সংহিতা', 'শুশ্রুতর' লেখা বই প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এছাড়া **ভাগভট্ট ও চক্রপাণিদত্তের** নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক উপাদানও পাওয়া গেছে।

অনুশীলনী

১। (ক) লৌহযুগ বলতে কি বুঝ? এই যুগে সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যা জানা লেখ।

(খ) কিভাবে রাজতন্ত্র গড়ে উঠল আলোচনা কর।

২। (ক) ব্যাবিলনের সভ্যতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) রাজা হামুরাবীর আইনগুলো কি কি? এই আইনের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জানা যায়?

৩। (ক) মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্য ও তার উপনিবেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(খ) সে যুগে মিশরের পুরোহিতদের সম্বন্ধে কি জান?

৪। (ক) পারস্য সাম্রাজের উত্থান সম্বন্ধে কি জান?

(খ) জরথুষ্ট্র কে ছিলেন? তাঁর জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে কি জান?

৫। (ক) প্রাচীনকালে ইহুদীরা কোথায় থাকত? তারা কি করে মিশরে গেল? সেখানে তাদের কি অবস্থা হল?

(খ) মূশা কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে কি জান? তিনি কিভাবে ইহুদীদের মিশর থেকে মুক্ত করলেন?

৬। (ক) গ্রীস দেশটি কোথায়? প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা কোন সভ্যতার সংস্পর্শে গড়ে উঠেছিল?

(খ) হোমার কে ছিলেন? তাঁর যুগ সম্বন্ধে কি জান?

(গ) গ্রীসের ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রগুলো সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর।

(ঘ) এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যা জান আলোচনা করা।

(ঙ) এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে কি যুদ্ধ হয়েছিল? এই যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধের ফলে কেউ লাভবান হয়েছিল কি?

(চ) এথেন্সের শিল্প, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ছ) পেরিক্লিস কে ছিলেন? তার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(জ) সফক্লিস, সক্রেটিস ও হেরোডেটাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঝ) আলেকজাণ্ডার কে ছিলেন? তাঁর ভারত অভিজান, গ্রীক সাম্রাজের পতন ও রোম কর্তৃক গ্রীসদেশ আক্রমণ সম্বন্ধে কি জান?

৭। (ক) রোম নগরী কি করে গড়ে উঠেছিল?

(খ) কার্থেজের সাথে রোমানদের যে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(গ) রোমের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

(ঘ) প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(ঙ) রোমের নাগরিকত্ব ও ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর।

(চ) জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন? রোমের সাধারণতন্ত্রের পতন কি ভাবে হল? নূতন সাম্রাজ্য গড়ে উঠল কেন?

(ছ) রোম সাম্রাজ্যের পতন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(জ) রোমে খ্রীষ্টানধর্মের বিকাশ কি ভাবে হল ?

৮। (ক) চীনের শাং বংশের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) কনফুসিয়াসের জীবন ও তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(গ) চীনের মহাপ্রাচীর সম্বন্ধে লেখ।

(ঘ) কোন রাজবংশের নাম অনুসারে দেশের নাম হয়েছে চীন ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৯। (ক) আর্যদের ভারতে আগমন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে কি জান ?

(গ) আর্যদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ঘ) আর্যদের ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১০। ভারতের প্রধান দুই মহাকাব্য কি কি ? এই দুই মহাকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১১। (ক) জৈন ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(খ) বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১২। (ক) মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? তিনি কিভাবে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন ?

(খ) মৌর্য সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(গ) সম্রাট অশোক সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৩। (ক) কণিষ্ক ও তাঁর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৪। (ক) গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(গ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জান ?

১৫। (ক) প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যা জান খুব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আমরা জানতে পারি কি করে ?

(গ) গুপ্তদের সময় বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৬। মধ্য এশিয়ার সাথে ভারতের যোগাযোগ এখনকার সমাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করেছিল কতটা ?

১৭। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে তদানীন্তন ভারতের সমাজ জীবন সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

১৮। (ক) প্রাচীন ভারতের শিল্প ও স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে অলোচনা কর।

(গ) প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৯। নীচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর বসাও :—

(ক) ব্যাবিলন ছিল……।	মধ্য এশিয়ার, ভারতে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়।
(খ) গ্রীকরা তাদের দেশকে বলত……।	হেলাস, গ্রীক, মেসোপটেমিয়া।
(গ) 'সপ্তসিন্ধু' বলা হত……।	ভারতের আর্যদের প্রথম বাসস্থান, আর্যাবর্ত, সিন্ধুসভ্যতা।
(ঘ) আর্যদের সভ্যতা ছিল……।	নাগরিক, গ্রামভিত্তিক।
(ঙ) মহাভারত রচনা করেন……।	মাঘ, কালিদাস, ব্যাসদেব।
(চ) রামায়ণ রচনা করেন……।	হোমার, বাল্মিকী।
(ছ) 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' রচনা করেন……।	হেরোডোটাস, হোমার।
(জ) প্রাচীন ভারতে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল …।	কলিকাতা, তক্ষশিলা নালন্দা, দিল্লী।
(ঝ) রোমের ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ করেছিল……নেতৃত্বে।	জুলিয়াস সীজারের, স্পার্টকাসের।
(ঞ) 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন……।	মাঘ, কৌটিল্য, চড়ক।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, S. C. Road